সাহসী মানুষের গল্প ১
মোশাররফ হোসেন খান

সাহসী
মানুষের
গল্প
১

সাহসী মানুষের গল্প ১

মোশাররফ হোসেন খান

আইসিএস পাবলিকেশন

সাহসী মানুষের গল্প-১
মোশাররফ হোসেন খান
প্রকাশনায়
আইসিএস পাবলিকেশন
৪৮/১-এ পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০
প্রথম প্রকাশ
শ্রাবণ : ১৪০১ বাংলা
আগস্ট : ১৯৯৪ ইংরেজি
রবিউল আউয়াল : ১৪১৫ হিজরি
দ্বিতীয় প্রকাশ
পৌষ : ১৪০৬
ডিসেম্বর : ১৯৯৯
রমযান : ১৪২০
তৃতীয় প্রকাশ
আষাঢ় : ১৪১৬
জুলাই : ২০০৯
রজব : ১৪৩০
কম্পোজ
র‍্যাক্স কম্পিউটার, ঢাকা
দাম
৪০ টাকা মাত্র

জীবনের চেয়ে দৃপ্ত মৃত্যু তখনি জানি
শহীদী রক্তে হেসে ওঠে যবে জিন্দেগানী
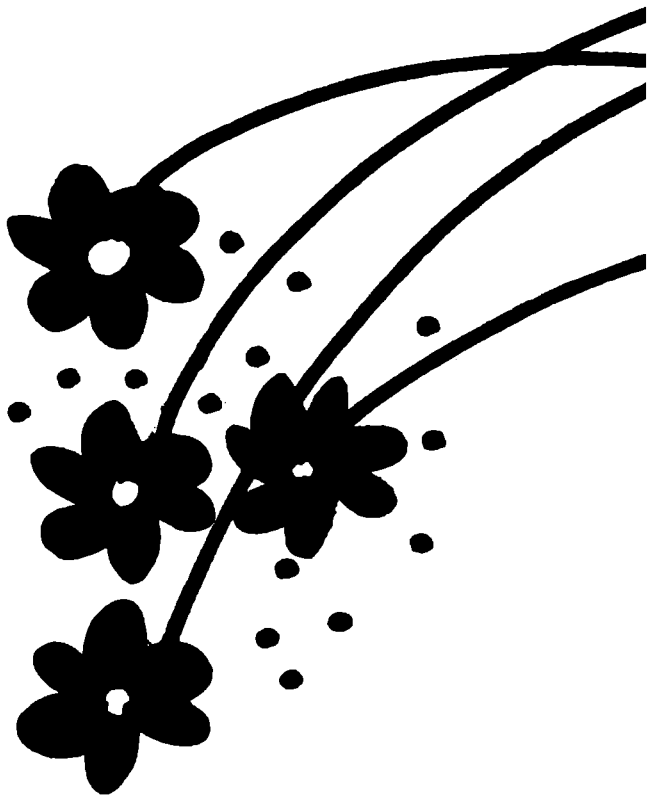
উৎসর্গ

দ্বীন প্রতিষ্ঠায় সাহসী ভূমিকা রাখতে
যে সব কিশোর যুবক জীবন বিলিয়ে দিলো
সেই সব মহান শহীদদের উদ্দেশ্যে–

আইসিএস পাবলিকেশনের অন্যান্য বই

১. রক্তাক্ত জনপদ
২. ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের পারস্পরিক সম্পর্ক
৩. ইসলামী আন্দোলন : সাফল্যের শর্তাবলী
৪. চরিত্র গঠনের মৌলিক উপাদান
৫. মোদের চলার পথ ইসলাম
৬. আদর্শ কিভাবে প্রচার করতে হবে
৭. মুক্তির পয়গাম
৮. এসো আলোর পথে
৯. আমরা কি চাই? কেন চাই? কিভাবে চাই?
১০. কর্মপদ্ধতি
১১. সংবিধান
১২. সাহসী মানুষের গল্প-২
১৩. সাহসী মানুষের গল্প-৩
১৪. সাহসী মানুষের গল্প-৪
১৫. সিলেবাসভিত্তিক কুরআন হাদীস সংকলন
১৬. ক্যারিয়ার বিকশিত জীবনের দ্বার
১৭. কিশোর মনে ভাবনা
১৮. মোরা বড় হতে চাই
১৯. অর্থনীতিতে রাসূলের (সা) দশ দফা
২০. ইসলামী অর্থনীতি নির্বাচিত প্রবন্ধ
২১. দিগ দিগন্ত তথ্যবহুল ৩ পাতা ক্যালেণ্ডার

গল্পসূচি
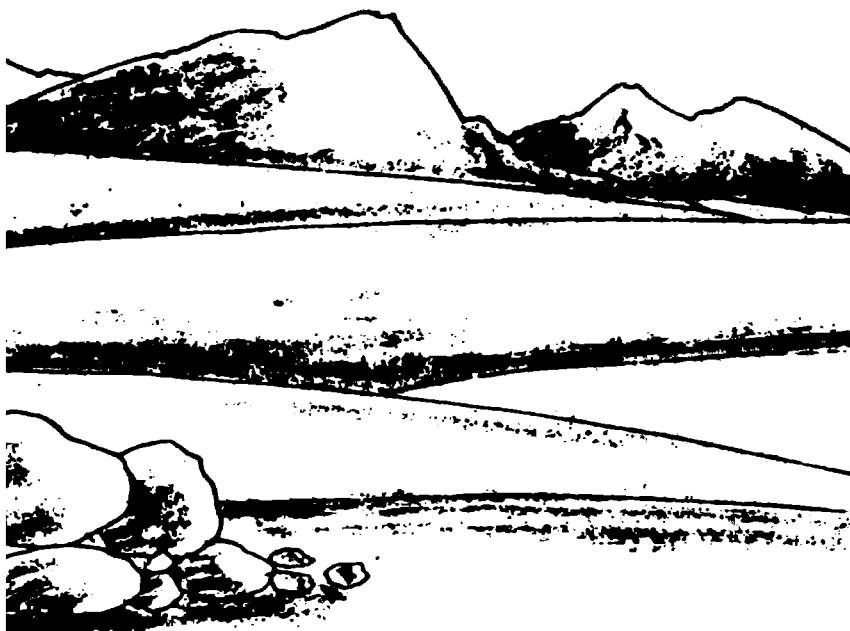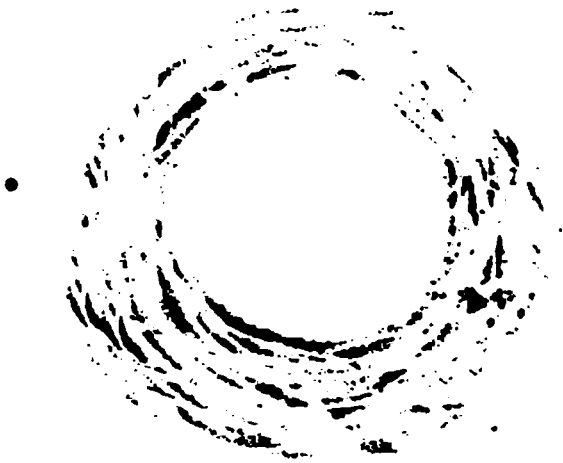
তায়েফের পথে আলোর পথিক

ভাবছেন আর ভাবছেন নবী মুহাম্মদ (সা)।

কী করবেন এখন?

মক্কার শত্রুদের আক্রমণ দিনে দিনে বাড়ছে। উত্তপ্ত আবহাওয়ায় মক্কা নগরী বিষাক্ত। অশান্ত লু হাওয়া। আপাতত আর মক্কায় থাকা চলবে না। এখানে এখন ইসলাম প্রচার করা সম্ভব নয়।

তাহলে? কিছুক্ষণ ভেবে নিলেন নবী (সা)। তারপর।—

তারপর সুদূরের পথ তায়েফ। বহু— বহু— দূরের পথ। নবীজী (সা) মক্কা থেকে সাময়িক বিদায় নিয়ে তায়েফের পথে রওয়ানা হলেন।

মরুভূমির পথ। বালি আর বালি। কোথাও কোনো গাছ নেই। নদী নেই। শুধু আছে ধু-ধু মাঠ। আর আছে ছোট বড় পাহাড় পর্বত। পাথরের নুড়ি। বহু পথ অতিক্রম করে চলে এসেছেন নবী (সা)। প্রায় সত্তর মাইল। পায়ে হেঁটে। বন্ধুর পথ। উঁচু-নিচু। পাথরের নুড়ি ছড়ানো। বহু কষ্টে হেঁটে চলেছেন দয়ার নবীজী (সা)।

বাস নেই। প্লেন নেই। জাহাজ কিংবা লঞ্চও নেই। এক আছে গাধা এবং উট। প্রিয় নবীর সাথে সেসব বাহনও নেই। তিনি চলেছেন পায়ে হেঁটে। ক্রমাগত হাঁটছেন তিনি।

আহার নেই।

নিদ্রা নেই।

বিশ্রাম নেই।

তিনি হাঁটছেন।

অবশেষে হাঁটতে হাঁটতে, বহু কষ্টে তিনি পৌঁছে গেলেন তায়েফ।

অপরিচিত একটি দেশ। অজানা-অচেনা রাস্তা-ঘাট। অচেনা এখানকার মানুষ– জনপদ।

তবু মুসলমানের জন্যে প্রত্যেকটি দেশই তার নিজের দেশ।

প্রত্যেকটি দেশের মানুষই তার আপন মানুষ। কাছের মানুষ।

প্রত্যেকটি দেশেই তার ঘর।

পেছনে মক্কা নগরী ফেলে নবীজী (সা) সুদূর তায়েফে এসেছেন। ইসলাম প্রচারের জন্যে।

মক্কার মানুষ আহ্বানে সাড়া দেয়নি। বরং তাঁকে কষ্ট দিয়েছে নির্মমভাবে। তবু তিনি নিরাশ হননি। হতাশ হয়ে ভেঙ্গে পড়েননি। তিনি অবশেষে কষ্ট স্বীকার করে তায়েফ এসেছেন ইসলামের দাওয়াত দেয়ার জন্যে।

মানুষকে সত্য পথে ডাকতে।

আল্লাহর বাণী শোনাতে।

সুন্দর শহর তায়েফ। মনোরম।

তায়েফের আবহাওয়াতে ছটফটানি নেই। ঝড়ের দাপাদাপি নেই। একটানা রোদের তেজ নেই। আবার একটানা বৃষ্টিও নেই। চারদিকে সবুজের হাতছানি। ক্ষেত ভরা ফসল। সবুজ সবজির ঢেউ তোলা ভাঁজ। খেজুর গাছের ঘন পল্লবে আরও উজ্জ্বল, আরও সুন্দর হয়ে উঠেছে

তায়েফের প্রান্তর। প্রাচুর্য আর সম্পদের শহর– তায়েফ।

কিন্তু সম্পদে তো আর সুখ বয়ে আনে না। সুখ আনে– মনের সৌন্দর্য, কোমলতা, পবিত্রতা এবং উত্তম চরিত্রে।

তায়েফবাসীদের সম্পদ ছিল অঢেল। কিন্তু তাদের মনে সুখ ছিল না। কেননা, তখনো সেখানে সুন্দর মানুষ গড়ে ওঠেনি। তারা একে অপরের সাথে কলহ-বিবাদে লিপ্ত থাকতো। অপরের হক অবৈধভাবে নষ্ট করতো। তারা বিভিন্ন পাপ কাজে লিপ্ত ছিল।

আঁতকে উঠলেন নবী (সা)। তাঁর কোমল হৃদয়ে ব্যথার জোয়ার দুলে উঠলো। তিনি দয়াল নবী। মানুষের অধঃপতন তিনি দেখতে পারেন না।

মানুষ তো আশরাফুল মাখলুকাত। সৃষ্টির সেরা। তাদের স্থান সবার ওপরে। কিন্তু পাপী মানুষের স্থান?

নবীজী (সা) ভাবেন– না, এদের কোনো দোষ না। কেননা এদের কাছে কোনো উত্তম এবং সুন্দর পথের আহ্বান আসেনি। এরা এখনো আলোর ছোঁয়া পায়নি। শোনেনি– সত্য সুন্দরের সুমিষ্ট বাণী।

নবীজী (সা) ভাবেন– তাদেরকে সত্য পথের সন্ধান দিতেই তো আমাকে মহান রাব্বুল আলামীন পাঠিয়েছেন। সুতরাং তায়েফবাসীকে দেখাতে হবে আলোর পথ।

তিনি উদাত্ত আহ্বানে তায়েফবাসীকে ডাকেন আলোর পথে।

ডাকেন সত্যের পথে।

কল্যাণের পথে।

তিনি তায়েফবাসীকে বুঝালেন– একদিন তোমরা মরে যাবে। কবরে যেতে হবে। কৃতকর্মের জন্যে হিসাব হবে। পাপ ও অন্যায় কাজের জন্যে শাস্তি পেতে হবে।

অতএব ফিরে এসো সত্যের পথে।

ফিরে এসো আল্লাহর পথে।

তিনি সত্য। তাঁর রাসূল মুহাম্মাদ (সা) সত্য।

তাঁর দ্বীন– ইসলাম সত্য।

আল্লাহ ছাড়া তোমাদের জন্যে আর কোনো প্রভু নেই। ত্রাণকর্তা নেই। তোমরা তাঁরই ইবাদাত কর।

আমার কাজ তোমাদের কাছে সত্য বাণী পৌঁছে দেয়া।

নবীর (সা) আহ্বানে তায়েফের অনেকেই সাড়া দিল। তারা ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিয়ে প্রশান্তির নিঃশ্বাস ছাড়লো। দীর্ঘদিনের আঁধারের ক্লান্তি ঝেড়ে ফেলে তারা আলোর ঝলকানিতে নতুন করে তাজা হয়ে উঠলো। সবল হলো। শান্তি ফিরে পেল।

কিন্তু কাফেররা রুখে দাঁড়ালো।

তাদের বিষাক্ত থাবা বেরিয়ে পড়লো। ছড়িয়ে পড়লো তারা তায়েফের অলিতে গলিতে।

কাফেরদের বুকে দাউ দাউ প্রতিশোধের আগুন। কে এসে তাদের কওমের লোকদেরকে বিভ্রান্ত করছে?

কাফেররা আরও ক্ষেপে যায়।

মহানবী (সা) তাদেরকে আহ্বান জানান–

এসো সত্যের পথে।

এসো আলোর পথে।

কাফেররা নবীর কথা শোনে না।

তারা প্রিয় নবীকে কষ্ট দিতে শুরু করে। পাথর ছুঁড়ে মারে। নবীজীর (সা) পবিত্র শরীর থেকে ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত ঝরে। রক্তে ভিজে যায় তাঁর দেহ। কদম মুবারক। তিনি কষ্ট পান। কিন্তু তিনি নিরাশ হন না। শরীরের সমস্ত ব্যথা-বেদনা কষ্টকে অকাতরে সহ্য করে তবু ঠোঁটে হাসির ফুয়ারা ঝরিয়ে তাদেরকে তিনি ডাকেন–

এসো সত্যের পথে।

এসো আলোর পথে।

এসো কল্যাণের পথে।

আল্লাহর পথই একমাত্র উত্তম পথ।

মুহাম্মাদের (সা) সাথীরা বললেন, কাফেরদের জন্যে বদ দোয়া দিন নবী। তারা তো শুধু কষ্টই দিয়ে যাচ্ছে। শত্রুতা করছে আমাদের সাথে।

কিন্তু মুহাম্মাদ (সা) দয়ার নবী। তিনি কেন বদ দোয়া দেবেন? প্রিয় নবী (সা) ক্ষমা করে দিলেন তাদেরকে।

নবীজীর ক্ষমা এবং মহানুভবতা দেখে কাফেরদের অনেকেই বিস্মিত হলো। অবাক হয়ে তারা নবীজীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। তাদের ভেতরে অনুশোচনার ঝড় বয়ে যায়। কৃতকর্মের জন্যে তারা দুঃখ প্রকাশ করে। লজ্জিত হয়ে নবীর (সা) কাছে ক্ষমা চায়।

নবীজী তাদেরকে কোমল হৃদয় দিয়ে স্পর্শ করেন। ইসলামের ছায়াতলে তাদের অশান্ত, অতৃপ্ত হৃদয়কে ডেকে নেন। তাদেরকে শোনান আল্লাহর বাণী। তারা পুলকিত হয়ে নবীকে (সা) আপন করে নেয়। তায়েফে সুখ-দুঃখের সাথী হয়ে যায়।

কাফেররা এতে আরও বেশি করে ক্ষেপে যায়।

নবীকে (সা) কষ্ট দেবার জন্যে, তাঁকে সত্যের আহ্বান থেকে বিরত রাখার জন্যে তারা নতুন নতুন কৌশল বের করে।

কিন্তু দয়ার নবী (সা) সব বাধাই দু'পায়ে মাড়িয়ে সামনে এগিয়ে চলেন। ক্রমাগত সামনে।

চরম ধৈর্যের সাথে তিনি মহান রাব্বুল আলামীনের দরবারে মুনাজাত করেন–

হে আল্লাহ! তুমি এদেরকে সঠিক জ্ঞান দাও।

ঈমান দাও। এরা অবুঝ। সত্য-মিথ্যার পার্থক্য বোঝে না।

এদের অন্তর থেকে সকল কালিমা দূর করে দাও।

এদের ওপর রহমত কর।

চরম শত্রুতা করা সত্ত্বেও এভাবে দয়ার নবী (সা) দোয়া করলেন তায়েফের অবিশ্বাসীদের জন্যে।

কালো পাহাড়ের আলো

হযরত বিলাল।

হাবশী ক্রীতদাস। গায়ের রং কুচকুচে কালো।

কিন্তু মানুষের বাইরের চেহারাটাই আসল চেহারা নয়। ভেতরটাই আসল। ভেতর অর্থাৎ হৃদয়টা যার ধবধবে পরিষ্কার সেইতো কেবল সুন্দর মানুষ।

বিলাল কালো হলে কি হবে!

তাঁর হৃদয়টি ছিল চাঁদের মতো পরিষ্কার। জোছনার মতো সুন্দর। সূর্যের মতো উজ্জ্বল। আর তাঁর বুকে ছিল বজ্রের সাহস।

সে সাহস ছিল সমুদ্রের মতো বিশাল। পর্বতের মতো অনড়।

কালো মানুষের ভেতর যে এত রূপ, এত সৌন্দর্য থাকতে পারে– তা বিলালকে না দেখলে বোঝাই যায় না। বিলালের এই সুন্দর-সৌন্দর্যের আসল রহস্য হলো– তাঁর বিশ্বাস।

তাঁর গভীর বিশ্বাস এবং ভালোবাসা ছিল আল্লাহর রহমতের ওপর। আল্লাহর ওপর নবীর (সা) ওপর।

তাঁর সকল আস্থা ছিল আল্লাহর রহমতের ওপর। আল্লাহর শক্তির ওপর।

আর নবীকে (সা) তিনি ভালোবাসতেন প্রাণ দিয়ে। তাঁর সে ভালোবাসায় কোনো খাদ ছিল না। এতটুকু কৃত্রিমতা ছিল না। তাই

ক্রীতদাস হয়েও বিলাল মনিবের রক্তচক্ষুকে ভয় না করে নবীর (সা) ডাকে সাড়া দিলেন।

ইসলাম গ্রহণ করে তিনি পরম তৃপ্তি এবং প্রশান্তি লাভ করলেন।

কেনা গোলাম হলে কী হবে?

মনিব তো কেবল একটি মানুষকে টাকা দিয়ে কিনতে পারে। সে তো আর মানুষের হৃদয় কিনতে পারে না।

বিলালের মনটাও তাঁর মনিব কিনতে পারেনি। এজন্যে তিনি স্বাধীন ছিলেন মনের দিক দিয়ে। আর স্বাধীন থেকেই তিনি তাঁর একমাত্র হৃদয়টা তুলে দিয়েছিলেন আল্লাহর হাতে। ইসলামের খেদমতে। নবীর (সা) ভালোবাসায়।

চুপে চুপে নয়। একেবারে সবার সামনে। প্রকাশ্যে তিনি ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দিলেন।

বললেন, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো প্রভু নাই। ইসলাম একমাত্র জীবন বিধান। আর নবী (সা) হলেন আল্লাহর প্রেরিত মহান পুরুষ। যিনি সত্যের আলো নিয়ে আমাদের মাঝে এসেছেন। তিনি এসেছেন সত্যের বারতা নিয়ে। মানুষের মুক্তির জন্যে।

হাবশী ক্রীতদাস বিলাল!

কুচকুচে কালো মানুষটির এই দৃঢ়কণ্ঠের আওয়াজ তার মনিব শুনতে পেল। শুনতে পেল কাফেররাও। তারা ক্রোধে ফেটে পড়লো। বললো,

কেনা গোলাম– কালো মানুষের এতবড় সাহস! এর পরিণাম বড় ভয়ানক।

বিলাল তাদের কথা যেন, শুনতেই পাননি। কারণ তিনি তো জানেন, দুর্বলদের ওপর সবলরা সব সময়ই অত্যাচার করে। জুলুম এবং নির্যাতন চালায়। এ আবার নতুন কী?

কাফেররা বললো, এখনো তুমি মুহাম্মাদের (সা) পথ থেকে ফিরে এসো বিলাল। তা না হলে তোমার কপালে অনেক দুর্ভোগ আছে। অনেক কষ্ট আছে।

হেসে উঠলেন বিলাল।

কালো মানুষের ভেতর থেকে ছিটকে পড়লো হাসির তুফান। বললেন, আমাকে ভয় দেখাচ্ছো? তোমরা কি জানো, যে হৃদয় একমাত্র আল্লাহ্ এবং তাঁর নবীকে (সা) ভালোবাসে, সে হৃদয় দুনিয়ার আর কাউকেই ভয় করে না! পরোয়া করে না! তোমরা আমাকে কিসের ভয় দেখাও? তোমরা আমাকে কী করতে পারো? মারবে? মারতে পারো। কিন্তু আমার বিশ্বাসকে তো আর কেড়ে নিতে পারবে না! না, কখনোই তা পারবে না।

গোলামের মুখে এই দুঃসাহসের কথা শুনে কাফেররা চরমভাবে ক্ষেপে গেল। জ্বলে উঠলো তাদের পাষণ্ড হৃদয়। তারা শুরু করলো তার ওপর পাশবিক নির্যাতন।

অত্যাচারী আবু জেহেল। মস্তবড় এক কাফের। বিশাল তার দলবল। আবু জেহেলের হুকুমে বিলালের ওপর ক্রমাগত চলেছে নির্যাতন আর নিষ্ঠুরতম অত্যাচার।

কাফেররা তাকে আরবের আগুনের মতো উত্তপ্ত মরুভূমির বালির ওপর নির্দয়ভাবে মারতো।

পাথরের কুঁচি এবং জ্বলন্ত আগুনের ওপর তাঁকে শুইয়ে দিত।

তাঁর গলায় দড়ি বেঁধে অবুঝ শিশুদের হাতে কাফেররা তুলে দিত।

শিশুরা বোঝে না। তারা খেলার ছলে বিলালকে টেনে হেঁচড়ে ছাগলের মতো করে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াতো মক্কার অলিতে গলিতে। ঝাঁঝরা হয়ে যেত বিলালের শরীর। তাঁর দেহ থেকে ঝরে ঝরে পড়তো টাটকা রক্ত।

আর আবু জেহেল?

সে নিজ হাতে বিলালকে শাস্তি দিল। তাকে উপুড় করে শুইয়ে দিত। তারপর বিলালের পিঠের ওপর পাথরের বড় বড় চাক্কি চাপিয়ে দিত।
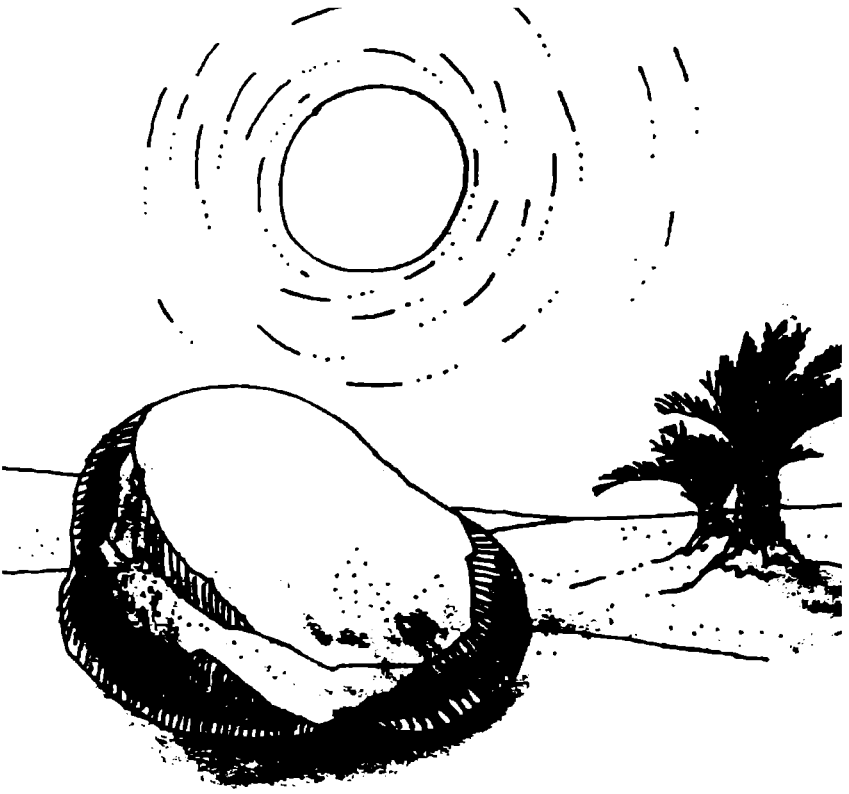
মরুভূমির মধ্যে সূর্যের চোখ থেকে যখন আগুন বের হয়, ঠিক সেই সময়ে আবু জেহেল বিলালের ওপর এভাবে পশুর চেয়েও জঘন্য আচরণ করতো।

গরম বালিতে বিলালের বুক পুড়ে যেত। পিঠের ওপর ভারী পাথরের চাপে তিনি বালির মধ্যে দেবে যেতেন। পিপাসায় বুক গলা শুকিয়ে যেত। পিপাসায় এবং যন্ত্রণায় তিনি ছটফট করতেন।

বিলালের কষ্ট দেখে হায়েনার মতো হেসে উঠতো নরপশু আবু জেহেল। বলতো,

এখনো সময় আছে বিলাল, মুহাম্মাদের (সা) আল্লাহ থেকে তুমি

ফিরে এসো। তোমাকে ছেড়ে দেয়া হবে। আর কোনো অত্যাচার করা হবে না তোমার ওপর।

কিন্তু যিনি একবার আল্লাহকে ভালোবেসে তাঁর সত্য দীনকে গ্রহণ করেছেন, তিনি মানুষের নির্যাতনের ভয়ে পরাজয় বরণ করবেন কিভাবে?

আল্লাহর প্রেমের কাছে, নবীর (সা) প্রেমের কাছে এই জুলুম অত্যাচার তো খুবই তুচ্ছ।

দুঃসাহসী বিলাল!

পর্বতের মতো যাঁর বিশ্বাস। তিনি তার বিশ্বাস থেকে এক চুলও নড়লেন না। বরং আবু জেহেলের সকল অত্যাচারের মধ্যেও তিনি হাসি মুখে জবাব দিলেন,

আল্লাহু আহাদ। আল্লাহু আহাদ।

বিলালের জবাবে পাপিষ্ঠ আবু জেহেল আরও বেশি ক্ষেপে যেত। আর সেই সাথে বেড়ে যেত তার অত্যাচারের মাত্রা।

কখনো বা গরুর কাঁচা চামড়ায় ভরে, আবার কখনো বা লোহার বর্ম পরিয়ে বিলালকে মরুভূমির মধ্যে– যখন দোজখের মতো সূর্যের তেজ, সেই সময় বসিয়ে রাখতো। প্রাণবায়ু বেরিয়ে যায় যায়, এমন সময়ে তাঁকে পাপিষ্ঠ আবু জেহেল বলতো,

এখনো ফিরে এসো বিলাল। আল্লাহ এবং মুহাম্মাদের (সা) পথ থেকে ফিরে এসো। আমরা তোমাকে ছেড়ে দেবো।

পর্বতের মতো অনড় বিলাল।

শত অত্যাচারেও তিনি তার বিশ্বাস থেকে ফিরে আসেননি। তখনো, সেই ক্লান্ত, মৃত্যুমুখে দাঁড়িয়েও বিলাল হাসি মুখে উচ্চারণ করেছেন,

আল্লাহু আহাদ। আল্লাহু আহাদ।

ইসলাম গ্রহণ করার কারণে বিলালের ওপর যে রকম অত্যাচার-নিপীড়ন নেমে এসেছিল তা এতই মর্মান্তিক যে এখনো মুখে সেই নির্যাতনের কথা উচ্চারণ করতেও গায়ের পশম মুহূর্তেই লাফিয়ে ওঠে।

অথচ কাফেরদের অত্যাচারের মাত্রা যত বেড়ে যেত, ততোই বেড়ে যেত বিলালের সহ্যশক্তি। বেড়ে যেত তার ধৈর্য। সেই সাথে বেড়ে যেত বিলালের আল্লাহ এবং তাঁর নবীর (সা) ওপর অপরিসীম প্রেম এবং ভালোবাসা।

একমাত্র প্রেম এবং ভালোবাসার জন্যে মানুষ সব ত্যাগই স্বীকার করতে পারে।

বিলাল ছিলেন এই চরিত্রের জ্বলন্ত প্রমাণ। তিনি ছিলেন সত্যের এক উজ্জ্বল প্রেমিক পুরুষ।

তিনি আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলকে (সা) ভালোবেসে যাবতীয় ত্যাগ স্বীকার করেছিলেন হাসি মুখে।

আল্লাহর সন্তুষ্টির অর্জন, তাঁর দীনকে প্রতিষ্ঠা করা এবং নবীর (সা) সাহচর্য ও ভালোবাসা লাভ করাই ছিল বিলালের একমাত্র উদ্দেশ্য।

একদিন বিলালের ওপর অকথ্য নির্যাতনের বেদনাদায়ক দৃশ্য নিজের চোখে দেখলেন হযরত আবু বকর। দেখে তিনি শিউরে উঠলেন। অনেক অর্থের বিনিময়ে গোলাম বিলালকে আজাদ করে দিলেন হযরত আবু বকর।

নবীকে দারুণ ভালোবাসতেন বিলাল। নবীও (সা) তাকে খুবই ভালোবাসতেন।

কালো হলে কী হবে?

বিলালের হৃদয়ে যে সত্যের সূর্য ছিল– তাতো ছিল অত্যন্ত প্রোজ্জ্বল। সে আলোর শিখা বিলালের কালো চামড়া ভেদ করে বেরিয়ে আসতো। মেঘ ফুঁড়ে সূর্য যেভাবে পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে, ঠিক সেইভাবে।

বিলালকে অত্যন্ত পছন্দ করতেন নবী (সা)। তিনি বললেন, বিলাল আযান দাও। আমরা নামাজ আদায় করবো।

বিলাল রাসূলের (সা) নির্দেশে আযান দিলেন।

বিলালই প্রথম আযানদাতা। অর্থাৎ প্রথম মুয়াজ্জিন।

বিলালের উচ্চ কণ্ঠের আযানের ধ্বনিতে চারদিকে মুখরিত হয়ে যেত। চারদিকে সাড়া সাড়া রব পড়ে যেত। তার আযান শুনে কোনো মুসলমানই আর ঘরে বসে থাকতে পারতেন না। পুরুষ, নারী, যুবক, বৃদ্ধ এমনকি শিশুরা পর্যন্ত বিলালের আযান শুনে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়তেন।

হযরত বিলাল!

এক সময়ের হাবশী ক্রীতদাস!

সেই কালো মানুষটি ছিলেন সত্যের পক্ষে অত্যন্ত বিনয়ী। আর অন্যায় ও মিথ্যার বিরুদ্ধে ছিলেন অনড় পর্বত।

বিলাল– কেবল একজন কালো মানুষের নাম নয়। বরং সত্য ও বিশ্বাসের আলোয় আলোকিত দুর্ভেদ্য এক কালো পাহাড়ের নাম–

হযরত বিলাল!

যে পাহাড় থেকে সত্য, বিশ্বাস এবং সাহসের আলো কেবলই ঝরে ঝরে পড়তো।
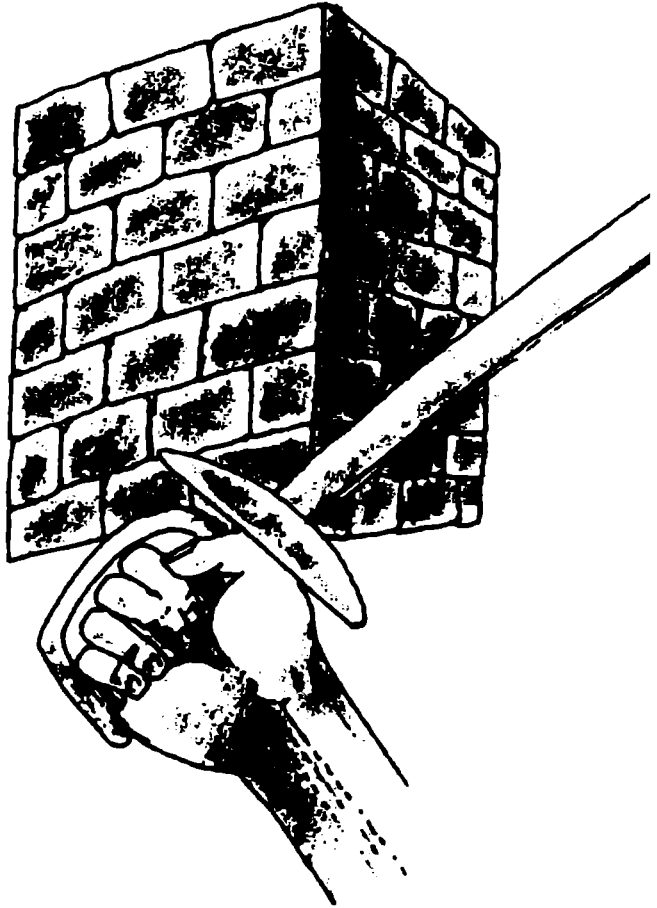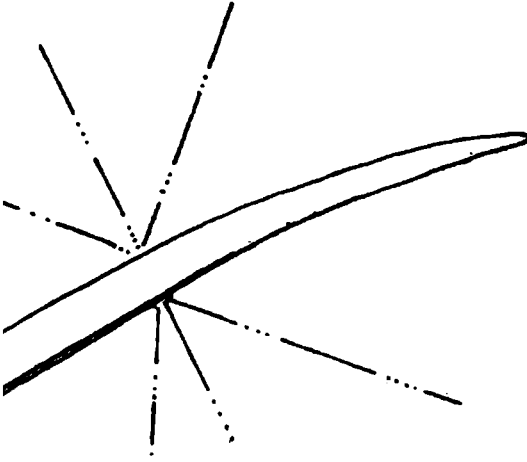
খাপ খোলা তলোয়ার

একেবারেই অন্ধকার যুগ।

পাপে আর পাপে ছেয়ে গেছে আরবের সমাজ।

মানুষের মধ্যে হানাহানি, যুদ্ধ, রক্তারক্তি লেগেই আছে।

মানুষের হেদায়েতের জন্যে আল্লাহ পাক নবীকে (সা) পাঠিয়েছেন। তিনি মানুষকে আলোর পথে ডাকছেন। ডাকছেন মুক্তির পথে।

নবীর (সা) ডাকে যারা সাড়া দিলেন, তাঁরা আলোর সন্ধান পেলেন। নবীর (সা) সাথে তাঁরাও ইসলাম প্রচার করেন।

কিন্তু গোপনে গোপনে। চুপে চুপে।

কাফেরদের অত্যাচারের ভয়ে কেউ ইসলাম গ্রহণের কথা প্রকাশ করেন না। আসলে, তখন সেই পরিবেশও ছিল না। পবিত্র কাবা ঘরে কেউ নামাজও আদায় করতে পারতেন না।

নামাজ আদায় করতেন তাঁরা গোপনে গোপনে।

কিন্তু এভাবে আর কতদিন?

সময় পাল্টে যায়।

পাল্টে যায় কালের নির্মম ইতিহাস।

সময়টাকে পাল্টে দেন হযরত ওমর। আল্লাহর অপরিসীম রহমতে। ওমর ইসলাম গ্রহণ করার পরপরই মক্কার আকাশে বাতাসে নতুন হাওয়া বইতে শুরু করে।

শুরু হলো ইসলাম প্রচার ও প্রতিষ্ঠার আর একটি নতুন অধ্যায়।

এতদিন কাফেরদের ভয়ে কেউ ইসলাম গ্রহণের কথা প্রকাশ করতে পারেননি।

কিন্তু ওমর?

ইসলাম গ্রহণের পর তিনিই সর্বপ্রথম প্রকাশ্যে ঘোষণা দিলেন, সবাইকে জানিয়ে দিলেন ইসলাম গ্রহণের কথা।

নির্ভীক ওমর! দুঃসাহসী ওমর!

তাঁর সাহস আর বীরত্বের কথা জানে না– মক্কায় তেমন কোনো লোকই নেই। ক্ষ্যাপা বারুদের মতো তাঁর তেজ।

রেগে গেলে ওমর মুহূর্তেই যে কোনো চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে পারেন। তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে বুকটান করে কেউ কথা বলার সাহস রাখে না। সবাই তাঁকে ভয় করে চলে।

ইসলাম গ্রহণের আগে ওমর সম্পর্কে এ রকম ধারণা ছিল মক্কার সকল মানুষের।

ওমরের তলোয়ারকে ভয় করে না, এমন লোক মক্কায় নেই।

সেই দুঃসাহসী ওমর ইসলাম গ্রহণ করেছেন!

ইসলাম গ্রহণের কথা প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়েছেন!

শুধু কি তাই?

তিনি সঙ্গী-সাথীদেরকে নিয়ে মক্কার পবিত্র কাবা ঘরে প্রবেশ করলেন।

প্রকাশ্যে নামাজ আদায় করলেন।

এই প্রথম কাবাঘরে প্রকাশ্যে নামাজ আদায়ের ঘটনা ঘটলো।

কাফেররা শুনলো সবই। দেখলো সবই। দেখলো, সঙ্গী-সাথীদেরকে নিয়ে দুঃসাহসী ওমর কাবায় যাচ্ছেন! নামাজ আদায় করছেন।

কাফেররা দেখলো, কিন্তু কেউ প্রতিবাদ করতে সাহস করলো না। কেউ বাধা দিতে ছুটে এলো না।

কে আসবে ওমরের সামনে?

কে আসবে তাঁর খাপ খোলা তলোয়ারের সামনে? এমন হিম্মত কার আছে?

ওমর বীরদর্পে হেঁটে গেলেন ইসলামের সবচেয়ে বড় দুশমন, সবচেয়ে বড় শত্রু আবু জেহেলের বাড়িতে। জোরে চিৎকার করে ওমর বললেন ঃ

ইসলামের দুশমন- আবু জেহেল! আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি। আল্লাহ ও রাসূলের (সা) প্রতি ঈমান এনেছি এবং রাসূলের (সা) কাছে প্রেরিত বিধান- আল কুরআন ও ইসলামকে সত্য বলে জেনেছি এবং মেনে নিয়েছি।

ওমরের হুংকার আবু জেহেল স্তম্ভিত হয়ে গেল। কিন্তু প্রতিবাদ করতে সাহস পেল না।

ওমর মিথ্যা ও পৌত্তলিক শক্তির বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে জিহাদ ঘোষণা করলেন।

ওমরের ইসলাম গ্রহণ করার সংবাদ চারদিকে ছড়িয়ে গেল দ্রুত গতিতে।

এ খবর শুনে কাফেরদের বুক ভয়ে আর বেদনায় টন টন করে উঠলো। আর মুসলমানদের হৃদয়ে খুশির তুফান বইতে শুরু করলো। তাঁরা আরও সাহসী হয়ে উঠলেন।

ওমর তাঁর সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে মক্কায় প্রকাশ্যে ইসলামের দাওয়াত দিতে শুরু করলেন। কাফেরদের নাকের ডগা দিয়ে মক্কার এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত ছুটে যান ওমর ও তাঁর সঙ্গী-সাথীরা।

তাঁরা একত্রে কাবায় নামাজ আদায় করেন।

কাবাঘরে তাওয়াফ করেন।

কেউ বাধা দিতে এলে তাঁরা তা প্রতিহত করেন।

তাঁরা প্রতিহত করেন কাফেরদের যে কোনো আক্রমণ।

অন্য মুসলমানরা গোপনে হিজরত করেন মদীনায়। আর ওমর হিজরত করেন প্রকাশ্যে।

মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করার আগে ওমর প্রথমে কাবাঘর তাওয়াফ করেন। তারপর কুরাইশদের মধ্যে গিয়ে চিৎকার করে বলেন,

কেউ যদি তার মাকে পুত্রশোকে কাঁদাতে চায়, তাহলে সে যেন এ উপত্যকার অপর প্রান্তে আমার মুখোমুখি হয়।

এই দুঃসাহসী ঘোষণা দিয়ে বীরের মতো তিনি মদীনার পথে রওয়ানা হলেন।

কাফেররা দেখলো, ওমর চলে যাচ্ছে কিন্তু তাঁকে বাধা দিতে কেউ সাহস পেল না।

ওমরের তলোয়ারের ভয়ে তারা প্রকম্পিত।

প্রাণ হারাতে কে যাবে তাঁর তলোয়ারের সামনে।

হযরত ওমর!

দুঃসাহসী ওমর!

নির্ভীক ওমর!

একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কাউকেই যিনি পরোয়া করেন না।

ভয় নামক শব্দটিকে যিনি তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিতে পারেন, তিনিই হযরত ওমর।

নবীকে (সা) তিনি ভালোবাসতেন প্রাণ দিয়ে। তাঁর সে ভালোবাসার কোনো তুলনা হয় না।

নবীর (সা) সাথে তিনি বদর, উহুদ, খন্দকসহ সকল যুদ্ধেই অংশ নিয়েছেন এবং বীরত্বের সাথে কাফেরদের মুকাবেলায় যুদ্ধ করেছেন।

নবীকে (সা) তিনি অত্যন্ত ভালোবাসতেন। নবীর (সা) ওফাতের সংবাদ শুনে তিনি বিশ্বাসই করতে পারেননি যে, নবী (সা) আর দুনিয়াতে নেই। নবীর (সা) মহব্বতে তখন তিনি পাগলপ্রায়। কোষমুক্ত তলোয়ার নিয়ে ওমর মসজিদে নববীর সামনে গিয়ে ঘোষণা দিলেন :

যে বলবে নবী (সা) ইন্তেকাল করেছেন, আমি তার মাথা দ্বিখণ্ডিত করে দেব।

ইসলামের প্রথম খলিফা ছিলেন আবু বকর (রা)।

আর দ্বিতীয় খলিফা হলেন হযরত ওমর (রা)।

দশ বছর খিলাফতকালে তিনি গোটা বাইজাইনটাইন, রোম ও পারস্য সাম্রাজ্যের পতন ঘটান।

তিনি বহু শহর এবং বহু রাজ্য জয় করেন।

অর্ধেক জাহানে তিনি ইসলামের বিজয় পতাকা ওড়াতে সক্ষম হন।

তাঁর সময়েই তিনি জেনার জন্যে দুররা মারা এবং মদপানের জন্যে আশিটি বেত্রাঘাত চালু করেন।

অর্ধেক জাহানের শাসনকর্তা হযরত ওমর।

কিন্তু ক্ষমতার মোহ তাঁকে কখনোই সত্য থেকে দূরে ঠেলে দেয়নি।

তিনি ছিলেন ন্যায়পরায়ণ শাসক। তাঁর কাছে ধনী-গরিব, ছোট-বড় কোনো ভেদাভেদ ছিল না। সকলের প্রতি তিনি ছিলেন সমান দরদি।

এতবড় শাসক হয়েও ব্যক্তিজীবনে ছিলেন হযরত ওমর অত্যন্ত সাধারণ একজন মানুষ। তাঁর ছিল না কোনো বাড়তি চাকচিক্য ছিল না কোনো জৌলুস। খুব গরিব হালে তিনি জীবন যাপন করতেন।

কিন্তু শাসক হিসেবে তিনি ছিলেন অত্যন্ত সচেতন।

তিনি নিজের চোখে মানুষের সুখ-দুঃখ দেখার জন্যে ঘুরে ঘুরে বেড়াতেন। দিনে এবং রাতের গভীরেও। তাঁর শাসনামলে মানুষ সুন্দরভাবে জীবন যাপন করতো। নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পারতো।

হযরত ওমর ছিলেন সবার কাছে অত্যন্ত বিশ্বাসী। তাঁকে বলা হতো আমীরুল মু'মিনীন।

তিনি মানুষকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন। সবার মুখে মুখে ফিরতো হযরত ওমরের নাম। তাঁর ইনসাফ ও ন্যায়পরায়ণতায় সকলেই মুগ্ধ ছিলো।

ভালো মানুষেরা ওমরকে ভালোবাসতো প্রাণ দিয়ে। আর দুষ্ট ও ইসলামের শত্রু ওমরের নাম শুনতেই ভয়ে কেঁপে কেঁপে উঠতো।

হযরত ওমর!

ওমরের বীরত্ব ও ন্যায়পরায়ণতা ইতিহাসে উজ্জ্বল হয়ে আছে।

ইসলাম গ্রহণের আগে তিনি যেমন ছিলেন উগ্র এবং দুঃসাহসী, ঠিক ইসলাম গ্রহণের পরও তিনি ছিলেন সত্যের পক্ষে প্রশান্ত এবং কোমল। আর মিথ্যা আর অন্যায়ের বিরুদ্ধে ছিলেন বরাবরই–

খাপ খোলা তলোয়ার।

কামারশালার সাহসী পুরুষ

উম্মু আনমার দাস কেনা-বেচার ব্যবসা করে।

তার নিজের জন্যেও একটি দাসের প্রয়োজন। তাগড়া হৃষ্টপুষ্ট একটি দাস চাই তার জন্য।

সে নিজে বাজারে গেল। শত দাসের ভেতর একটি দাস তার খুব পছন্দ হলো। দাসটি যেমন জোয়ান তেমনি তাগড়া।

উম্মু আনমার দাসটি কিনে নিয়ে এলো।

দাসটির নাম- খাব্বাব।

খাব্বাবকে তরবারি তৈরির কলা কৌশল শেখানোর জন্যে উম্মে আনমার তাকে মক্কার এক বিখ্যাত কর্মকারের কাছে পাঠিয়ে দিল।

খুব অল্প দিনের মধ্যেই খাব্বাব ভালো এবং উন্নতমানের তরবারি বানানো শিখে গেলেন।

দাস হলেও তিনি ছিলেন ছোটকাল থেকেই দারুণ মেধাবী। সেই সাথে ছিল তার সততা, নিষ্ঠা এবং সাহস।

এ সময়ে নবী (সা) মক্কায় গোপনে ইসলাম প্রচার করতেন।

ইসলাম প্রচারের খবর পেয়ে যুবক খাব্বাব অল্পদিনের মধ্যেই চুপি চুপি নবীর (সা) কাছে গিয়ে ইসলাম গ্রহণ করলেন।

ইসলাম গ্রহণের পর থেকেই শুরু হলো খাব্বাবের জীবনের আর এক অধ্যায়।

এই অধ্যায়টি ছিল খাব্বাবের জন্যে অগ্নিপরীক্ষার অধ্যায়। জুলুম, নির্যাতন আর অত্যাচারের পরেও ঈমানের পরীক্ষায় ধৈর্যের সাথে টিকে থাকার অধ্যায়।

যুবক খাব্বাব ইসলাম গ্রহণ করেছে– এ খবর বাতাসের আগে ছড়িয়ে পড়লো চারদিক। কথাটি উম্মু আনমারের কানেও গেল।

সে তার দলবল নিয়ে কামারশালায় এসে কর্মরত খাব্বাবকে জিজ্ঞেস করলো, তুমি নাকি ইসলাম গ্রহণ করেছো?

হ্যাঁ।

কামারশালায় কাজ করতে করতে খাব্বাব দৃঢ়তার সাথে জবাব দিলেন।

কেনা দাসের এই জবাব শুনে আনমারার মাথায় খুন চেপে গেল। সে তার দলবলসহ ঝাঁপিয়ে পড়লো খাব্বাবের ওপর। বললো,

তোর এত বড় সাহস! আমার কেনা দাস হয়ে তুই আমার ধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণ করেছিস!– বলতে বলতে কামারশালার হাতুড়ি এবং লোহার পাত দিয়ে খাব্বাবকে মারতে শুরু করলো।

তাদের আঘাতে আঘাতে খাব্বাব রক্তাক্ত হয়ে গেলেন। তার সমস্ত শরীর দিয়ে রক্তের ধারা গড়িয়ে পড়তে থাকলো। তিনি জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন।

আর একদিনের ঘটনা।

কামারশালায় কাজ করতে করতে খাব্বাব ভাবছিলেন ইসলামের কথা। ভাবছিলেন আল্লাহর কথা। ভাবছিলেন নবীর (সা) কথা। ভাবতে ভাবতে তিনি আনমনা হয়ে যান। নিজের সাথেই নিজে কথা বলেন।

একসময়ে কুরাইশদের কিছু লোক তাদের বায়না দেয়া তরবারি নিতে খাব্বাবের দোকানে এলো। তারা দেখলো, খাব্বাব যেন কার সাথে কথা বলছেন।

তারা জিজ্ঞেস করলো, আমাদের তরবারি কি বানানো হয়েছে?

খাব্বাব যেন তাদের কথা শুনতেই পাননি। বরং হেসে বললেন, তোমরা কি তাঁকে দেখেছো?

তারা ক্ষেপে গেল ভীষণভাবে। বললো কার কথা বলছো?

খাব্বাব খুব শান্তভাবে হেসে হেসে বললেন, আমি নবী মুহাম্মাদের (সা) কথা বলছি। তিনি এমন একজন মানুষ, যার চারদিক থেকে সত্যের আলো ছিটকে পড়ে। তাঁর চোখে মুখে নূরের চেরাগ। জ্বলতে থাকে জ্বলজ্বল করে। ঠিক নক্ষত্রের মতো। পূর্ণিমার চাঁদের মতো। ভোরের সূর্যের মতো। তিনি আল্লাহর রাসূল। আমাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোয় আনবার জন্যে আল্লাহ্ তাঁকে পাঠিয়েছেন। তিনি আমাদের সত্যের অগ্রপথিক। সত্য পথের রাহবার।

এ কথা শুনার সাথে সাথে তারা বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়লো খাব্বাবের ওপর।

তাদের নির্মম– নিষ্ঠুর প্রহারে খাব্বাবের শরীর রক্তে ভেসে গেল। যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে তিনি এক সময় অচেতন হয়ে গেলেন।

ইসলাম গ্রহণের কারণে, নবীকে (সা) ভালোবাসার কারণে খাব্বাবকে সহ্য করতে হয়েছে হয়েছে অমানুষিক নির্যাতন।

নিষ্ঠুর কাফেররা দুপুরে প্রচণ্ড রোদের তাপের মধ্যে খাব্বাবকে টেনে হেঁচড়ে নিয়ে যেত মরুভূমির উত্তপ্ত উপত্যকায়। তারপর তাকে সম্পূর্ণ উলঙ্গ করে তার শরীরে লোহার বর্ম পরাতো। এভাবে তাঁকে আগুনের মতো উত্তপ্ত উপত্যকায় ফেলে রাখতো সূর্যাস্ত পর্যন্ত।

প্রচণ্ড গরমে এবং পিপাসায় কাতর হয়ে পানি–পানি বলে চিৎকার করতেন খাব্বাব।

কাফেররা তাকে একটুও পানি দিত না। বরং বলতো, এবার বল মুহাম্মাদ (সা) সম্পর্কে তোর মন্তব্য কী?

খাব্বাবের যন্ত্রণাকাতর মুখ থেকে একফালি হাসির রেখা তখনো ভেসে উঠতো। বলতেন,

মুহাম্মাদ (সা) আল্লাহর বান্দাহ্ এবং রাসূল। তিনি সত্য দ্বীন নিয়ে এসেছেন। তিনি আমাদের মুক্তির বার্তাবাহক।

খাব্বাবের জবাব শুনে তারা আবারও তার ওপর নির্যাতন চালাতো।

তারা পাথর গরম করে সেই পাথরের ওপর খাব্বাবকে খালি গায়ে শুইয়ে দিত। তারপর গরম পাথরের ওপর তাঁকে চেপে ধরে রাখতো। গরম পাথরের চাপে খাব্বাবের কাঁধের চর্বি গলে বেয়ে বেয়ে পড়তো। তাঁর পিঠের গোশত উঠে যেত। তিনি যন্ত্রণায় ছটফট করতেন। পিপাসায় কাতরাতেন।

নিষ্ঠুর কাফেররা খাব্বাবের যন্ত্রণা দেখে দানবের মতো হেসে উঠতো।

খাব্বাব যন্ত্রণার মধ্যেও আল্লাহ এবং তার প্রিয় নবীকে (সা) ডাকতেন। ডাকতে ডাকতে তিনি এক সময় নির্যাতনের নিষ্ঠুরতায় জ্ঞান হারিয়ে ফেলতেন।

অত্যাচারী কাফেরদের নির্যাতনের এরকম শিকার হতেন খাব্বাব। দিনের পর দিন– এভাবে প্রতিদিন চলতো তাদের নির্মম নিষ্ঠুর অত্যাচার খাব্বাবের ওপর।

আনমারার এক অত্যাচারী ভাই ছিল। সে প্রতিদিন খাব্বাবের
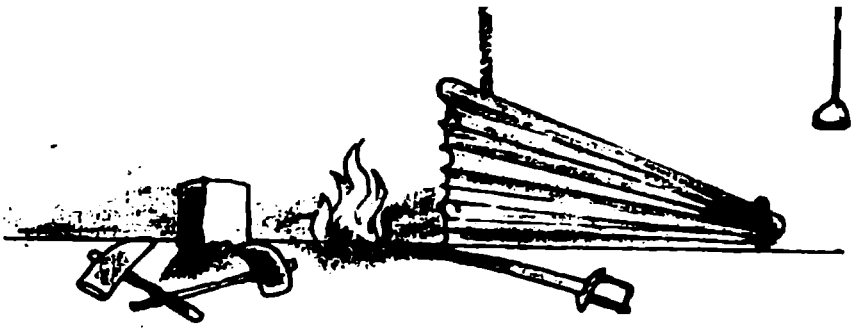
কামারশালার দোকানে আসতো। এসেই সে কামারশালার হাপর থেকে তুলে নিত গনগনে লোহার পাত। উত্তপ্ত-জ্বলন্ত লোহার পাত নিষ্ঠুর কাফের চেপে ধরতো খাব্বাবের মাথায়।

তীব্র যন্ত্রণায় খাব্বাব কাটা কবুতরের মতো কেবলই ছটফট করতেন। এবং ছটফট করতে করতে এক সময় জ্ঞান হারিয়ে ফেলতেন।

ইসলাম গ্রহণ করার কারণে কাফেররা খাব্বাবের ওপর যে নিষ্ঠুর অত্যাচার আর নির্যাতন করেছে, তা এতই নির্মম- মুখে উচ্চারণ করতেও শরীর শিউরে ওঠে।

আল্লাহকে ভালোবেসে, নবীকে (সা) ভালোবেসে, সত্য দীনকে ভালোবেসে খাব্বাব শুকনো পাতার দাউ দাউ আগুনের মতো শাস্তি ভোগ করেছেন সারাটি জীবন।

দাস হওয়া সত্ত্বেও, দরিদ্র এবং দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও দুঃসাহসী খাব্বাব কুরাইশদের অহমিকার বিরুদ্ধে, তাদের মিথ্যার বিরুদ্ধে, তাদের কুসংস্কার এবং বিকৃতির বিরুদ্ধে পর্বতের মতো রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। তাদের কাছে, মিথ্যার কাছে মাথানত করেননি কখনো।

কাফেরদের এত শাস্তি এবং নিষ্ঠুরতার পরও খাব্বাব একচুল পরিমাণও সত্যের পথ থেকে কখনো দূরে সরে আসেননি।

তাদের হাজারো অত্যাচারেও এতটুকু ঘাবড়ে যাননি কামারশালার সাহসী পুরুষ- হযরত খাব্বাব।
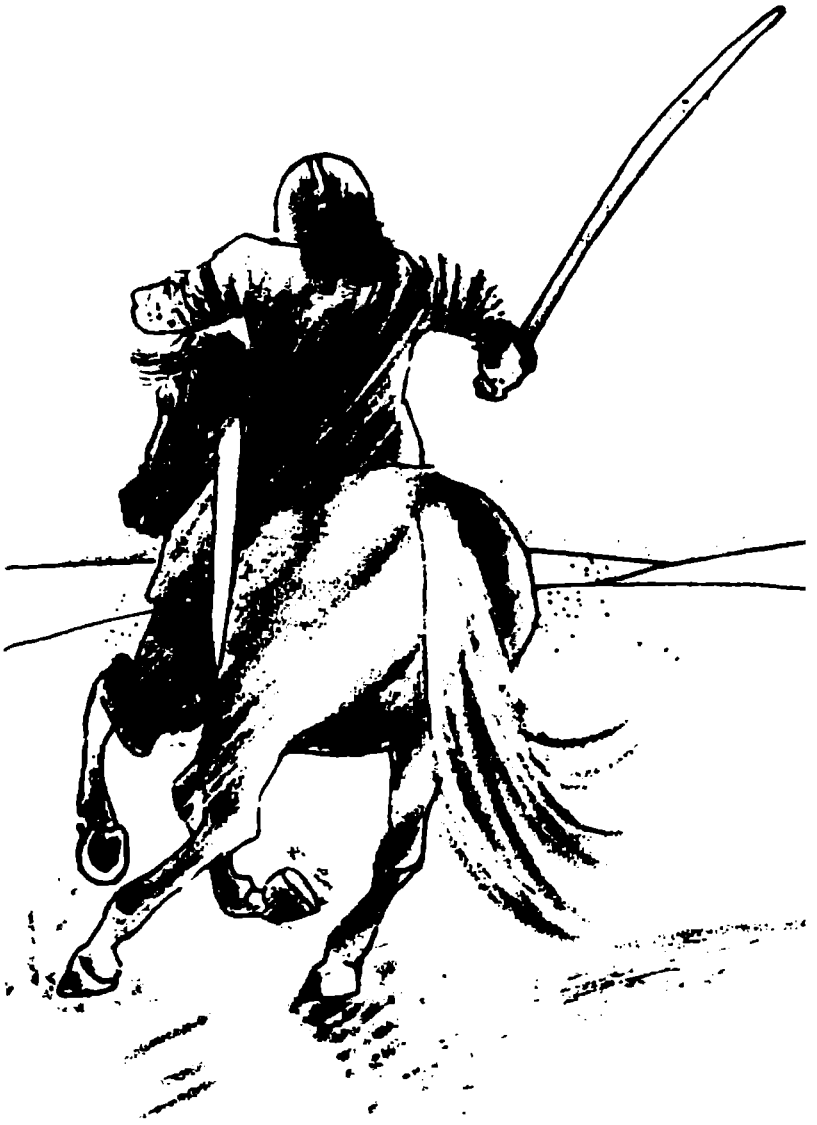
আল্লাহর তরবারি

চারদিকে ইসলামের প্রচার কাজ চলছে।

মক্কা এবং মদীনার লোকেরা জেনে গেছে পবিত্র ইসলাম এবং নবীর (সা) নাম।

দলে দলে মানুষ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে পরম প্রশান্তির সাথে দ্বীনের পথে কাজ করছেন। কাজ করছেন তাঁরা নবীর (সা) কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে।

একই সাথে।

খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ তখনো ইসলাম কবুল করেননি।

তিনি ভাবলেন। ভাবলেন নির্জনে বসে।

গভীর রাত্রিতে।

অনেক চিন্তা ভাবনা করে দেখলেন।

ভাবতে ভাবতে তিনি অস্থির হয়ে ওঠেন। পাপ এবং অন্যায়ের জন্যে তিনি ব্যথিত হলেন। ভাবলেন, এভাবে আর কতোদিন?

কতোদিন আর এভাবে অন্যায় ও অসত্যের পথে চলবো?

খালিদের ভেতর সত্য বিবেক সহসা জেগে উঠলো। তিনি পাপের পথ থেকে, অন্ধকারের পথ থেকে ফিরে এলেন।

ফিরে এলেন ইসলামের পথে।

সুদূর মদীনায় গিয়ে নবীর (সা) কাছে হাজির হয়ে বললেন,

আমি অনেক পাপ করে ফেলেছি। আমার পাপের জন্যে অনুতপ্ত। আমি এখন সত্য- মিথ্যার পার্থক্য বুঝতে পেরেছি। আর পাপের পথে পা বাড়াতে চাইনে। এবার আমাকে ইসলাম গ্রহণ করার সুযোগ দিন। এবং আমার পাপ মুক্তির জন্যে হে দয়ার নবী (সা) একটু দোয়া করুন।

আল্লাহর নবী (সা) খালিদের কথায় অত্যন্ত খুশি হলেন। তিনি খালিদের জন্যে দোয়া করলেন।

ইসলাম গ্রহণের পর শুরু হলো খালিদের জীবনের আর এক অধ্যায়।

সে অধ্যায় সংগ্রামের।

সে অধ্যায় যুদ্ধের।

সে অধ্যায় অগ্নিপরীক্ষার।

ইসলাম গ্রহণের আগে খালিদ ছিলেন মুসলমানদের জন্যে চরম দুশমন।

আর ইসলাম গ্রহণের পর তিনিই হলেন কাফের ও মুশরিকদের জন্যে ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক।

খালিদের তরবারির সামনে দাঁড়াতে সাহস করে না কোনো খোদাদ্রোহী শক্তি। কোনো মুশরিক।

তাঁর তরবারি অসংখ্য যুদ্ধে মুশরিকদের মস্তক দ্বিখণ্ডিত করে দিয়েছে। তাদেরকে করে দিয়েছে ছিন্নভিন্ন।

খালিদের তরবারি দিয়ে আগুনের হলকা ছোটে।

ইসলাম গ্রহণের পর খালিদ প্রথমেই মুতার যুদ্ধে অংশ নেন।

এটাই তাঁর জীবনে ইসলামের পক্ষে প্রথম যুদ্ধ।

মুতার যুদ্ধে খালিদ অত্যন্ত বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করেন। একে একে তিনজন মুসলিম সেনাপতি শহীদ হয়ে গেলেন। এই দৃশ্য দেখে সাধারণ

সৈনিকদের মনে সাহসের রশিটা একটু ঢিলে হয়ে গেল। তারা কিছুটা ঘাবড়ে গেলেন।

কিন্তু ঘাবড়ালেন না খালিদ।

তিনজন সেনাপতি শহীদ হবার পর তিনিই সেনাপতির দায়িত্ব নিয়ে যুদ্ধ পরিচালনা করেন। বীর-বিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়েন শত্রুর ওপর।

বীরের মতো বীর খালিদ!

সিংহ পুরুষ খালিদ!

তার বীরত্বের ফলে নিশ্চিত ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পেল মুসলিম বাহিনী।

মুতার যুদ্ধে খালিদের হাতে একে একে সাতখানা তরবারি ভেঙ্গে যায়।

ইসলামের ইতিহাসে এটা একটি বিরল ঘটনা।

মক্কা বিজয়ের সময় নবীর (সা) সাথে ছিলেন খালিদ। যদিও বিনা রক্তপাতে মক্কা বিজয় করা হয়, তবু কিছুতো রক্ত ঝরেছিল।

সেটা আর কিছু না, কয়েকজন মুশরিক খালিদের দিকে তীর নিক্ষেপ করলে তার জবাব দিলেন তীরের মাধ্যমে খালিদ। এতে কয়েকজন মুশরিক প্রাণ হারায়।

হুনাইনের যুদ্ধে খালিদ অত্যন্ত বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করেন। শত্রুর আক্রমণে তার শরীর ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যায়। সে ক্ষত দিয়ে রক্ত ঝরে। তার শরীর রক্তে ভিজে যায় তবুও তিনি এতটুকু দমে যাননি। শত্রুর আক্রমণে তিনি এতটুকু পিছিয়েও আসেননি। বরং শত্রুর আক্রমণ যতো তীব্র হচ্ছিল, ততোই খালিদের তরবারি ঝলসে উঠছিল।

তায়েফ অভিযানেও খালিদ ছিলেন অগ্রগামী বাহিনীর কমান্ডিং অফিসার।

জাহেলি যুগে, কুরাইশদের মূর্তি পূজার কেন্দ্রগুলোর একটি ছিল 'উযযা'।

নবী (সা) খালিদকে পাঠালেন সেটা ধ্বংস করে দেবার জন্যে।

দুঃসাহসী খালিদ নবীর (সা) নির্দেশ সেখানে গেলেন এবং তিনি সেটা মুহূর্তেই মাটিতে মিশিয়ে দিলেন।

নবীর (সা) ওফাতের পরের ঘটনা।

হযরত আবু বকর তখন খলিফার আসনে। এসময়ে আরবের চারদিকে ইসলাম ত্যাগকারী, নবুওয়াতের মিথ্যাদাবিদার ও যাকাত প্রদানে অস্বীকারকারীরা মাথাচাড়া দিয়ে উঠলো।

খলিফা আবু বকর একটি মুসলিম বাহিনীর নেতৃত্ব দিয়ে খালিদকে পাঠালেন ভণ্ড নবীর দাবিদার তুলাইহাকে শায়েস্তা করার জন্যে।

খালিদ তাঁর বাহিনী নিয়ে রওয়ানা হলেন।

তুমুল লড়াই হলো সেখানে।

লড়াইয়ে তুলাইহার সঙ্গী-সাথীরা পরাজিত হলো।

তুলাইহার বহু সঙ্গীকে খালিদের বাহিনী হত্যা করলেন এবং তার ত্রিশজন সঙ্গীকে বন্দী করে খালিদ নিয়ে এলেন আবু বকরের কাছে।

খালিদ মুসাইলামা কাজ্জাবের বিরুদ্ধেও অভিযান পরিচালনা করেন।

এই যুদ্ধে হযরত হামজার হন্তা মুসাইলামা কাজ্জাব নিহত হয় হযরত ওয়াহিশীর হাতে।

ভণ্ড নবীদের নির্মূল করার পর খালিদ রুখে দাঁড়ালেন মুরতাদদের বিরুদ্ধে।

রুখে দাঁড়ালেন যাকাত প্রদানে অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে।

খালিদের প্রতিটি অভিযানই সফল হলো।

প্রতিটি যুদ্ধেই তিনি বিজয়ী হয়ে ফিরে এলেন।

এরপর মহাবীর খালিদ যাত্রা করেন ইরাকের দিকে।

ইরাকে একে একে অনেক যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং প্রতিটি যুদ্ধেই খালিদ বিজয়ী হন।

তার সাহস এবং যুদ্ধ কৌশলের নিপুণতায় সমগ্র ইরাককে তিনি পদানত করেন।

ফাহলের যুদ্ধে খালিদের কাছে রোমান বাহিনী দারুণভাবে পরাজিত হয়।

তারা পুনরায় দেমাশক দখলের প্রচেষ্টা চালায়।

প্রচণ্ড যুদ্ধ চলছে।

হঠাৎ পেছন থেকে ধূমকেতুর মতো উপস্থিত হলেন মহাবীর খালিদ।

রোমান বাহিনীর একে একে বহু সৈন্য নিহত হলো খালিদের তরবারির আঘাতে।

তাদের শোচনীয় পরাজয়ের পর তারা আবার খালিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হলো।

সেনাপতি মাহানের নেতৃত্বে দুই লাখ চব্বিশ হাজার রোমান সৈন্য ইয়ারমুকে সমবেত হলো।

রোমানদের যুদ্ধ যাত্রার খবর পেয়ে গেলেন হযরত আবু বকর (রা)। তিনি বললেন– আল্লাহর কসম! খালিদের দ্বারাই আমি তাদেরকে পরাস্ত করবো।

ইয়ারমুকের যুদ্ধ।

ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ।

মহাবীর খালিদ তাঁর বাহিনীকে দ্রুত প্রস্তুত করে রওয়ানা হলেন ইয়ারমুকের দিকে।

এই যুদ্ধে তিনি মহিলাদের হাতেও তরবারি তুলে দিলেন।

বললেন, যদি কোনো মুসলিম সৈন্য যুদ্ধের ময়দান ছেড়ে পিছটান দেন– তাহলে তাকে এই তরবারি দিয়ে হত্যা করবে।

নিজের সৈনিকদেরকে তিনি সাবধান করে দিয়ে বললেন, প্রয়োজনে শহীদ হবেন, কিন্তু যুদ্ধের ময়দান ছেড়ে কেউ পালাবার চেষ্টা করবেন না।
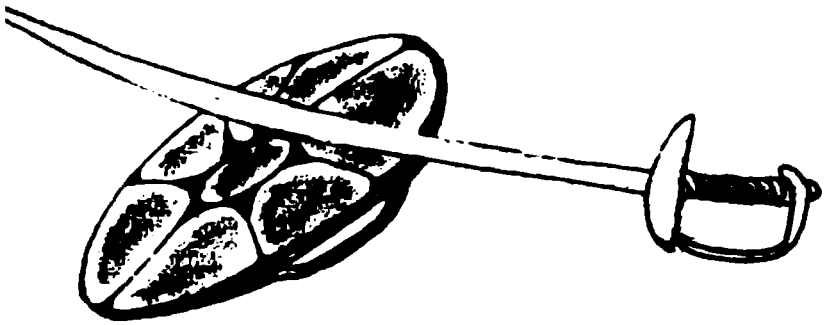
যুদ্ধের পূর্বে রোমান সেনাপতি খালিদের সাথে কথা বললো। সে বললো,

তোমাদের অনেক অভাব। অনেক ক্ষুধা। তাই তোমরা দেশ ছেড়ে এখানে এসেছো।

তোমরা চাইলে আমরা তোমাদেরকে দশটি করে দীনার দেব। এক প্রস্থ কাপড় দেব এবং তোমাদেরকে খাদ্যও দেব। আগামী বছরও তোমরা এভাবে জিনিসপত্র পাবে। তোমরা এখান থেকে চলে যাও। শুধু এই শর্তটুকু মানো।

রোমান সেনাপতির কথায় মহাবীর খালিদ অত্যন্ত অপমানবোধ করলেন। তার ব্যক্তিত্ব এবং তার বীরত্বে আঘাত লাগলো।

তিনি রোমান সেনাপতিকে উচিত জবাবই দিলেন।–

বললেন, আমরা মুসলমান! আমরা বীরের জাত! অর্থের বিনিময়ে আমাদেরকে কেনা যায় না।

বলেই তিনি ঘোড়ার পিঠে উঠে বসলেন এবং ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরে খালিদ সোজা ছুটে চললেন তার নিজ বাহিনীর ছাউনির দিকে।

এবং তারপর।–

তারপর সেনাপতি খালিদ 'আল্লাহু আকবর' বলে রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন।

রোমানদের অশ্বারোহী এবং পদাতিক বাহিনীর মধ্যভাগে ঢুকে পড়লেন মহাবীর খালিদ।

তিনি যেদিকে যান, সেদিকেই সব সাফ!

খালিদের তরবারির সামনে রোমান বাহিনী ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল।

একদিন এবং একরাত– একাধারে যুদ্ধ চললো।

পরদিন প্রভাতেই সবাই অবাক হয়ে দেখলো রোমান সেনাপতির মঞ্চের ওপর বীর দর্পে দাঁড়িয়ে আছেন স্বয়ং খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ।

ইয়ারমুকের যুদ্ধের সময় খালিদের তরবারির তেজ দেখে রোমান বাহিনীর কমান্ডার জারজাহ তার ছাউনি থেকে বের হয়ে এলেন।

ভয়ে ভয়ে তিনি খালিদের কাছে এগিয়ে গেলেন। বিনয়ের সাথে জিজ্ঞেস করলেন,

মহাবীর খালিদ! আপনি সত্যি করে বলুন তো, আল্লাহ কি আসমান থেকে আপনাদের নবীকে (সা) এমন কোনো তরবারি দান করেছেন, যা তিনি আপনাকে দিয়েছেন এবং সেই তরবারি আপনি যাদের বিরুদ্ধেই ওঠান, তারাই পরাজিত হতে বাধ্য হয়!

রোমান কমান্ডার জারজাহর কথা শুনে খালিদ হেসে উঠলেন।

খালিদের বীরত্ব এবং ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ হয়ে জারজাহ তখনই ইসলাম কবুল করলেন। এবং রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে শহীদ হলেন।

ইয়ারমুকের এই গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধে বিজয়ের পর খালিদ 'হাদির' জয় কবেন।

'হাদির' জয় করার পর তিনি 'কিন্নাসরীন–এর দিকে অভিযান চালান। মুসলিম বাহিনীকে প্রতিরোধের জন্যে তারা পূর্বেই কিল্লার প্রবেশদ্বার বন্ধ করে দিয়েছিল।

খালিদ চিৎকার করে তাদেরকে বললেন,

তোমরা কোথায় পালাবে?

যদি মেঘমালার ওপরও আশ্রয় নাও, তাহলে আল্লাহ আমাদেরকে সেখানে উঠিয়ে নেবেন। অথবা তোমাদেরকে নামিয়ে আনবেন আমাদের তরবারির সামনে।

তোমরা কোথাও পালাতে পারবে না।

কিন্নাসরীনের অধিবাসীরা হিমসবাসীদের করুণ পরিণতির কথা চিন্তা করে খালিদের সাথে সন্ধি চুক্তি সম্পাদন করতে বাধ্য হলো।

ইসলাম গ্রহণের পর থেকে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত যুদ্ধের ময়দানেই সময় কেটেছে মহাবীর খালিদের।

তিনি প্রায় শোয়াশো যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। তার শরীরের প্রায় প্রতিটি অংশেই বর্শা, তীর অথবা তরবারির আঘাতের চিহ্ন স্পষ্ট ছিল।

খালিদ ছিলেন যুদ্ধপ্রেমিক এক দুঃসাহসী বীর পুরুষ।

যুদ্ধই যার নেশা।

যুদ্ধই যার ধ্যান।

ইসলামের সপক্ষে তিনি ছিলেন অতন্দ্র এক সেনাপতি। আর তার তরবারি সর্বদা কোষমুক্ত থাকতো শত্রুর মোকাবেলায়।

তার বন্ধু এবং শত্রু-সবাই বলতেন, খালিদ এমন এক যোদ্ধা, যিনি নিজেও ঘুমান না, অন্যকেও ঘুমাতে দেন না।

আর মহাবীর খালিদ বলতেন,

আমার একটি পুত্র সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার সুসংবাদের চেয়েও আমার কাছে ইসলামের পক্ষে শত্রুর মোকাবেলা করা এবং একটি যুদ্ধ অধিক প্রিয়।

এই হলেন মহাবীর খালিদ।

খালিদের মৃত্যুর পর হযরত ওমর (রা) যার সম্পর্কে বলতেন,

নারীরা খালিদের মতো সন্তান প্রসবে অক্ষম হয়ে গেছে।

আর নবী (সা) তাঁর সাহাবীদেরকে বলতেন,

তোমরা খালিদকে কষ্ট দিও না। কারণ সে কাফেরদের বিরুদ্ধে চালিত আল্লাহর তরবারি।

খালিদকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন নবী (সা)। তিনি বলেছেন,

খালিদ আল্লাহর তরবারি। যা কাফের ও মুনাফেকদের বিরুদ্ধে কোষমুক্ত করেছেন।

মহাবীর খালিদ!

খালিদ– আল্লাহর তরবারি!

এই সম্মানজনক বীরত্বের খেতাবটি দিয়েছেন স্বয়ং নবী (সা)। সাইফুল্লাহ বা আল্লাহর 'তরবারি' উপাধি একজনই মাত্র পেয়েছেন। তিনি দুঃসাহসী হযরত খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ।

নিঃসঙ্গ বেদুইন

গিফার গোত্রের এক ডানপিটে যুবক অসীম সাহসী। দুর্বার তার চালচলন। গোত্রের প্রায় সবাই খুন রাহাজানি আর ডাকাতি করে। নানান পাপাচারে তারা লিপ্ত।

সেটা ছিল জাহেলি যুগ।

গোত্রের অন্যদের সাথে যুবকও রাহাজানি আর ডাকাতিতে জড়িয়ে পড়লেন।

তার ছিল যেমন সাহস, তেমনি ছিল বুদ্ধির বহর। ফলে অল্প দিনের মধ্যেই তিনি বিখ্যাত ডাকাত হিসেবে পরিচিত হয়ে যান।

তার ভয়ে চারদিকে কম্পমান। সবার মুখে মুখে ফেরে তার নাম।

কি ভয়ঙ্কর দস্যি যুবক!

সময় বয়ে যায় স্রোতের মতো। মৌসুমও বদলে যায়। বদলে যায় হাওয়ার গতি।

কিছুকাল পরেই যুবক বুঝতে পারেন, কাজটি বড় অন্যায়। বড় জঘন্য! ডাকাতি রাহাজানি কি কোনো সভ্য মানুষের পেশা হতে পারে? কার জন্যে এসব? কিসের জন্যে?

নিজের ভেতর পুড়তে থাকেন যুবক। পুড়তে থাকেন বিবেকের আগুনে।

পুড়তে পুড়তে রূপোলী বৃষ্টির ছোঁয়া পেয়ে যান তিনি। যুবক ছেড়ে দেন তার পাপের পেশা। ছেড়ে দেন ডাকাতি আর রাহাজানি। তারপর–

তারপর খুঁজতে থাকেন সোনালি রোদ্দুর।

কোথায় সেই রোদ্দুর?

যার উত্তাপে তার মুষড়ে পড়া, ভেঙ্গে যাওয়া হৃদয়খানি আবার ভোরের মতো কোমল হয়ে উঠতে পারে?

জাহেলি যুগ।

তবু তিনি মূর্তিপূজা করেন না। দেব-দেবীর উপাসনাও করেন না।

ডাকাতি ছেড়ে দিয়ে এক আল্লাহর ইবাদাতেই মশগুল হয়ে গেলেন তিনি। আল্লাহর ধ্যানেই কেটে যায় তার সকাল দুপুর। অষ্ট প্রহর।

তখনও তিনি নবীর (সা) সংবাদ পাননি। জানেন না রাসূলের (সা) কথা।

একজন বললো, মক্কার এক ব্যক্তি তোমার মতো 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলে থাকেন। তিনি নবী (সা)। তাঁর কাছে ওহি আসে।

চমকে উঠলেন যুবক। তাই নাকি!

যুবকটির নাম আবুযার।

গিফার গোত্রে জন্ম বলে তিনি 'আবুযার গিফারী' নামেই পরিচিত এবং বিখ্যাত হয়ে ওঠেন।

লোকটির কাছে নবীর (সা) আবির্ভাবের সুসংবাদ পেয়ে আবুযার তার ভাই আনিসকে মক্কায় পাঠালেন। বললেন, নতুন নবীর (সা) সম্পর্কে সবকিছু ভাল করে জেনে আসবে।

আনিস মক্কায় গিয়ে নবী (সা) সম্পর্কে বিস্তারিত জানলেন। তাকে দেখলেন। ফিরে এসে আবুযারকে সেসব কথা খুলে বললেন।

আবুযার শুনলেন। কিন্তু পিপাসা মিটলো না।

পরদিন তিনি নিজেই রওয়ানা হলেন মক্কার উদ্দেশে।

আবুযার চলছেন মক্কার পথ বেয়ে। খুঁজছেন নবীকে (সা)। কিন্তু কারুর কাছে জিজ্ঞেস করতে পারছেন না। কোথায় তিনি?

মক্কার লোকেরা খুব খারাপ। তারা খুবই বদমেজাজি। আবুযার শুনেছেন তাদের সম্পর্কে এসব কথা। নবীর (সা) কথা জানতে চাইলে তারা ক্ষেপে গিয়ে মারতেও পারে।

সারাদিন ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত আবুযার। তবুও নবীর (সা) দেখা পেলেন না। দিন শেষে বিশ্রামের জন্যে শুয়ে পড়লেন মসজিদুল হারামের এক কোনায়।

পরদিন আবার বের হলেন।

ঘুরলেন মক্কার অলিতে গলিতে। আবারও ক্লান্ত হয়ে মসজিদে বিশ্রাম নিলেন।

হঠাৎ আলীর (রা) চোখে পড়লো তার এই যাতায়াত। তিনি বুঝলেন এ কোনো আগন্তুক মুসাফির। কাছে গিয়ে বললেন,

আমার বাসায় চলুন। আপনি খুব পরিশ্রান্ত। বিশ্রাম নেবেন।

আলীর (রা) বাসায় গেলেন তিনি। পরদিন আবারও বের হলেন। এভাবে কয়েকদিন কেটে গেল।

আলী (রা) এ ক'দিন তার কাছে কিছুই জিজ্ঞেস করেননি। কিন্তু আজ তার মনে সন্দেহ দেখা দিল। মুসাফিরটি একমনে কাকে খুঁজছেন?

বললেন, আপনি কোন্ উদ্দেশ্যে মক্কায় এসেছেন?

আবুযার বললেন,

আমি বহুদূর থেকে এসেছি। এসেছি নতুন নবীর (সা) সাথে সাক্ষাতের আশায়। তাঁকে জানার জন্যে। বুঝার জন্যে। শংকিত হৃদয়ে আবুযার চেয়ে রইলেন আলীর দিকে।

আলী (রা) বললেন, কাল সকালে আমার পিছে পিছে যাবেন। তবে খুব সাবধানে। আমি যেখানে প্রবেশ করবো, আপনিও সেখানে প্রবেশ করবেন।

আনন্দ আর উত্তেজনায় অস্থির আবুযার। চোখে তার ঘুম নেই।

কখন শেষ হবে এই রাত? কখন হবে প্রভাত? সারারাত চেয়ে থাকেন প্রতীক্ষার চাতক।

প্রতীক্ষার পালা শেষ হলো।

অবশেষে পৌঁছুলেন তারা নবীর (সা) কাছে।

খুশিতে দুলে উঠলো আবুযারের প্রাণ। নবীকে (সা) দেখে ফুলে উঠলো তার বুকের ছাতি। সমুদ্রের মতো বিশাল হলো তার হৃদয়ের সাহস। ইসলামের দাওয়াত কবুল করলেন আবুযার গিফারী।

নবী (সা) বললেন, তুমি যে ইসলাম গ্রহণ করেছো– একথা এখন মক্কার কাউকে কিন্তু বলবে না। এরা কেউ জানতে পারলে তোমার জীবনের আশংকা দেখা দিতে পারে।

আমি মক্কা ছেড়ে যাবো না। যতোক্ষণ পর্যন্ত মসজিদে গিয়ে কুরাইশদেরকে প্রকাশ্যে সত্যের দাওয়াত দিতে না পারি। নির্ভীককণ্ঠে বললেন দুঃসাহসী আবুযার।

তিনি মসজিদে গেলেন।

কুরাইশরা তখন বসে বসে গল্পগুজবে মশগুল।

তাদের মধ্যে ঝড়ের বেগে উপস্থিত হলেন আবুযার। বজ্রের মতো তার কণ্ঠ। বললেন,

হে কুরাইশ গোত্রের লোকেরা! আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি এক আল্লাহ ছাড়া আর কোনো প্রভু নেই। মুহাম্মাদ (সা) আল্লাহর রাসূল।

তার কথাগুলো সীসার মতো কুরাইশদের কানের ভেতর বিঁধে গেল। তীরের ফলার মতো আঘাত করলো তাদের হৃদয়ে।

ক্রোধে ফেটে পড়লো তারা ক্ষুধার্ত বাঘের মতো। তারা ঝাঁপিয়ে পড়লো আবুযারের ওপর। আঘাতের পর আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত করে দিল তাকে।

রক্তাক্ত হলেন আবুযার।

নবীর (সা) চাচা আবদুল মুত্তালিব তাকে রক্ষা করলেন কুরাইশদের হাত থেকে। ধমকের সাথে বললেন তিনি, এ কি করছো তোমরা? গিফার গোত্রের লোকের গায়ে আঘাত করলে? তোমরা বাণিজ্যে যাবে কোন্ পথে? জানো তাকে হত্যা করার পরিণাম কি হতে পারে!

ক্রুদ্ধ কুরাইশরা ছেড়ে দিল তাকে।

একটু সুস্থ হয়ে তিনি ফিরে এলেন নবীর (সা) কাছে। তাকে রক্তাক্ত দেখে ব্যথিত হলেন নবী (সা)। বললেন,

তুমি ফিরে যাও। ফিরে যাও তোমার গোত্রে। সেখানে গিয়ে তুমি দীনের দাওয়াত দিতে থাকো। মানুষকে সত্যের পথে ডাকো। আল্লাহর পথে ডাকো। নবীর (সা) কথা বলো। তারা উপকৃত হবে। আর যখন জানবে– আমি প্রকাশ্যে দাওয়াত দিচ্ছি, তখন আবার আমার কাছে ফিরে এসো।

আবুযার ফিরে গেলেন প্রিয় নবীর (সা) নির্দেশ মতো। ফিরে গেলেন নিজের গিফার গোত্রে।

তার আহ্বানে নিজের পরিবারের একে একে সবাই ইসলাম কবুল করলেন। সত্যের আহ্বানে সাড়া দিলেন একজন দু'জন করে গিফার গোত্রের অনেক লোক। শান্তির সুবাতাস টেনে নিলেন তারা বুক ভরে।

নবী (সা) প্রকাশ্যে দীনের দাওয়াত দিচ্ছেন, শুনলেন আবুযার।

তিনি আর দেরি না করে রওয়ানা হলেন মক্কার পথে।

আবারও মক্কায় এলেন আবুযার। গোত্রের লোকদের সাথে তিনি মরুভূমিতে থাকেন।

একে একে শেষ হলো বদর উহুদ ও খন্দকের মতো বড় বড়ো যুদ্ধের দিনগুলো।

তারপর একদিন তিনিও হিজরত করলেন মদীনায়।

মদীনায় এসে আবুযার নবীকে (সা) আরও বেশি করে কাছে পেলেন। তাঁর সেবা, যত্ন আর সান্নিধ্যে কাটিয়ে দেন সময়গুলো।

তাবুকের যুদ্ধের জন্যে বেরিয়ে পড়লেন নবী (সা)। সাথে অন্যান্য সাহাবীও আছেন।

অনেকে এসেছেন। আবার আসেননি অনেকেই। আবুযারকেও

দেখা যাচ্ছে না। কেউ কেউ রাসূলকে (সা) বললেন, নিশ্চয়ই আবুযার পিছটান দিয়েছেন!

রাসূল (সা) কিছুই বললেন না। শুধু শুনলেন তাদের কথা। হঠাৎ একজন বললেন, ঐ যে– দূর থেকে কেউ যেন একাকী আসছেন!

নবী (সা) সেদিকে না তাকিয়েই বললেন, আবুযারই হবে।

সত্যিই তাই।

মাঝপথে দুর্বল উটের পিঠ থেকে মালপত্র নামিয়ে নিজের কাঁধে তুলে নিয়ে তিনি পায়ে হেঁটেই পৌঁছুলেন সেখানে।

ক্লান্ত আবুযারকে দেখে সবাই অবাক হলেন।

রাসূল (সা) বললেন, আল্লাহ আবুযারের ওপর রহম করুন। সে একাকী চলে, একাকী মরবে, কিয়ামতের দিন একাই উঠবে।

হলোও তাই।

নবীর (সা) কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রমাণিত হলো।

রাসূলের (সা) ইন্তেকালের পর আবুযার চলে গেলেন মদীনা ছেড়ে। না নিজের গোত্রে, না কোনো লোকালয়ে।

তিনি চলে গেলেন মদীনা থেকে অনেক– অনেক দূরে, মরুভূমির আর এক প্রান্তে রাবজা নামক স্থানে।

তাঁর এই স্বেচ্ছা-নির্বাসনে সবাই অবাক হলেন।

কিন্তু পর্বতের মতো শক্ত রইলেন আবুযার।

এই তেপান্তর মরুভূমিতে পর্যাপ্ত খাবার নেই। নেই পানির সুব্যবস্থা। নেই আরাম আয়েশের কোনো উপাদান।

দুনিয়ার বিলাসত্যাগী সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করলেন না। পরকালপ্রেমিক আবুযার সেখানে কঠিন জীবন যাপন করতে থাকলেন।

সাথে ছিলেন তার স্ত্রী।

রোগে ভুগে কাহিল হয়ে পড়লেন আবু যার। তিনি তখন খুবই অসুস্থ।

পাশে বসে কাঁদছেন তাঁর স্ত্রী।

আবুযার বললেন- কাঁদছো কেন?

এই জনমানবহীন মরুভূমির মধ্যে আপনি পরকালের দিকে যাত্রা করছেন। এখানে কোনো কিছুই নেই। এমনকি আমাদের দু'জনের পরিধানের বস্ত্র ছাড়া আমাদের কাছে আর কোনো সম্বল নেই। আল্লাহ না করুন, আপনি মারা গেলে আপনার কাফনের কাপড় তো সংগ্রহ করতে পারবো না! বলতে বলতে ডুকরে কেঁদে উঠলেন তাঁর স্ত্রী।

তিনি ধীর কণ্ঠে বললেন- কেঁদোনা!

কেন? স্ত্রী জিজ্ঞেস করলেন।

আবুযার বললেন, একটি সুসংবাদ আছে।

সুসংবাদ? স্ত্রীর চোখে আনন্দধারা ঝিলিক দিয়ে উঠলো।

হ্যাঁ। সুসংবাদ। আমি নবীকে (সা) বলতে শুনেছি, যে মুসলমানের দুই অথবা তিনটি সন্তান মারা গেছে, জাহান্নামের আগুন থেকে তাকে বাঁচানোর জন্যে তাই যথেষ্ট।

তিনি আরও বলেছিলেন, তোমাদের মধ্যে এমন একজন আছে যে মরুভূমিতে মৃত্যুবরণ করবে। এবং তার মৃত্যুর সময় অকস্মাৎ একদল মুসলমান সেখানে উপস্থিত হবে। আমি ছাড়া আর সকলে লোকালয়ে মারা গেছে। অতএব আমার মৃত্যু হবে এই মরুভূমিতে। আর তুমি দেখে নিও, একদল মুসলমান অবশ্যই এখানে এসে যাবে।

আবুযার দৃঢ় কণ্ঠে স্ত্রীকে বললেন।

গায়েবি সাহায্যের প্রত্যাশায় আবু যারের স্ত্রী রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকলেন।

কী আশ্চর্য! সত্যিই এলো গায়েবি মদদ।

একদল ইয়ামেনী মুসলমান কুফা থেকে আসছিল। তাদেরকে দেখে ইশারায় ডাক দিলেন আবুযারের স্ত্রী।

তারা এসেই জিজ্ঞেস করলেন ইনি কে?

আবুযার।

রাসূলুল্লাহর (সা) সাহাবী?

হ্যাঁ।

আবুযারের কথা জেনেই তারা সেখানে থেকে গেলেন।

তারা এগিয়ে গেলেন অসুস্থ আবুযারের শয্যার পাশে।

আবুযার তাদেরকে রাসূলের (সা) ভবিষ্যদ্বাণী শুনালেন। তারপর বললেন,

যদি আমার অথবা আমার স্ত্রীর কাছে কাফনের পরিমাণ কাপড় পাওয়া যায় তাহলে তা দিয়েই আমার কাফনের ব্যবস্থা করবে। আর যে ব্যক্তি সরকারের ক্ষুদ্রতম পদেও অধিষ্ঠিত, আল্লাহর কসম! সে যেন আমার কাফন না পরায়।

আবুযার ছিলেন অত্যন্ত সাধারণ মানুষের মতো।

জীবন যাপনে ছিল না তার বিলাসিতা। দুনিয়ার সুখের জন্যে এতটুকুও তিনি লালায়িত ছিলেন না।

অতি সাধারণভাবে তিনি জীবন যাপন করতেন। তার ঘরে কোনো আসবাবপত্রও ছিল না। ছিল না সংসার যাপনের জন্যে অতি প্রয়োজনীয় সামগ্রীও।

একবার একজন তার ঘরে প্রবেশ করে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, আপনার ঘরে তো কিছুই নেই! আপনার আসবাবপত্র কোথায়?

আখেরাতে। সেখানে আমার একটি বাড়ি আছে। আমার যাবতীয় আসবাবপত্র সেখানেই পাঠিয়ে দিয়েছি। আবুযার হেসে জবাব দিলেন।

আবুযার ছিলেন প্রকৃত অর্থেই আখেরাতপ্রত্যাশী। আর দুনিয়ার সম্পদের প্রতি ছিলেন অত্যন্ত নির্লোভী। মোহহীন।

সিরিয়ার আমীর তার কাছে একবার তিনশ' দীনার পাঠালে তিনি অত্যন্ত রেগে গেলেন। বললেন, শামের আমীর কি আমার থেকে অধিকতর কোনো নীচ ব্যক্তিকে পেলেন না!

দীনারগুলি গ্রহণ না করে তিনি পুনরায় ফেরত পাঠালেন।

হযরত আবুযার ছিলেন সরল, সাদাসিধে। দুনিয়া বিরাগী। নির্জনতাপ্রিয়। আবার তিনিই ছিলেন জ্ঞানের সমুদ্র। ছিলেন সত্যের জ্বলন্ত শিখা।

নবী (সা) তার সম্পর্কে একবার বলেছিলেন, আসমানের নিচে এবং জমিনের ওপরে আবুযার সর্বাধিক সত্যবাদী ব্যক্তি।

এই সত্যবাদী জ্ঞানের মহাসমুদ্র ঘুমিয়ে পড়লেন একদিন।

ঘুমিয়ে পড়লেন চিরতরে দুনিয়ার ভিখারী সম্বলহীন, নিঃসঙ্গ এক বেদুইন ঠা ঠা মরুভূমির উত্তপ্ত বালির ভেতর।

আবুযার!

সত্যের সিংহপুরুষ! তার মৃত্যু নেই।

তিনি মরেননি। সত্যের নক্ষত্রেরা মরেন না কখনো।

আলোর খোঁজে বহুদূর

গ্রামটির নাম 'জায়ান'।

পারস্যের ইসফাহান অঞ্চলের একজন ধনাঢ্য পিতার ঘরে ধীরে ধীরে বেড়ে ওঠে একটি শিশু।

প্রকৃতির আলো-হাওয়ায় বাড়তে থাকে শিশুটি। বাড়তে বাড়তে হয়ে যায় নওজোয়ান।

রাজপুত্রের মতো সুন্দর ফুটফুটে নওজোয়ানকে সবচেয়ে ভালোবাসে তার পিতা।

তিনি গ্রামের সর্দার। একমাত্র পুত্র তার নয়নের মণি। কলিজার টুকরা। পিতা চান না ছেলের অমঙ্গল। চান না কোনো রকম বিপদ তার ছেলেকে স্পর্শ করুক। এজন্যে তিনি ছেলেকে ঘরের ভেতর আবদ্ধ করে রাখেন।

নওজোয়ান ঘরের ভেতর আবদ্ধ থাকে সারাক্ষণ।

খাঁচার পাখির মতো তার হৃদয়ে দুলে ওঠে মুক্তির দুর্বার ঢেউ।

সে মুক্তি পেতে চায়। পেতে চায় মুক্ত বাতাসের ছোঁয়া। দেখতে চায় চাঁদ জোছনা আর প্রকৃতির নির্মল শোভা।

দিন যায়, মাস যায়। নওজোয়ানের প্রতীক্ষার প্রহর বাড়তে থাকে। কিন্তু মুক্তির সুযোগ আর আসে না।

অবশেষে একদিন এলো।

তার পিতার ছিল বিশাল খামার। তিনি সেদিন নিজে আর খামারে যেতে পারলেন না। আদরের ছেলেকে বললেন,

আমিতো আজ খামারে যেতে পারছিনে। তুমিই যাও। কাজ কর্ম একটু দেখাশুনা করে এসো।

পিতার কথা শুনে নওজোয়ানের বুকে আনন্দের ঝড় বয়ে গেল। আবদ্ধ ঘর থেকে সে বের হয়ে আসে। দু'চোখ ভরে দেখে পাখির ঝাঁক। ফুলের শোভা। সবুজ প্রকৃতি। নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে টেনে নেয় বুকের ভেতর শীতল হাওয়া।

আহ! মুক্তির স্বাদই আলাদা!

নওজোয়ান হাঁটছে মনের আনন্দে। ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখছে চার পাশের সবুজ গাছ-গাছালি গুল্মলতা। শুনছে পাখির কলরব। দেখছে আকাশে মেঘের খেলা। দেখছে আর ভাবছে। ভাবছে আর হাঁটছে।

হঠাৎ সে থমকে দাঁড়ালো। ওপাশে কাদের আওয়াজ?

গুন গুন্ করে কথা বলছে কারা?

নওজোয়ান কান খাড়া করে শুনতে থাকে।

এক পা দু'পা করে এগিয়ে যায়।

ধীরে ধীরে সেই ঘরটির কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। আবারও তার কানে ভেসে এলো প্রার্থনার শব্দ।

ঘরটি শুধু ঘর নয়। একটি গির্জা। এখানে খ্রিস্টানরা উপাসনা করে।

নওজোয়ান তো আর এদের উপাসনার খবর জানে না। তার পিতা একজন বিখ্যাত অগ্নি-উপাসক। পিতার কাছ থেকে সে আগুনের উপাসনাই শিখেছে।

গির্জার লোকদের কাছে নওজোয়ান জিজ্ঞেস করলো তোমরা এখানে কি করছো?

আমরা প্রভুর প্রার্থনা করছি। তারা জবাব দিল।

তাদেরকে দেখে নওজোয়ান খুশি হলো। তার হৃদয়ে অন্যরকম হাওয়া বইতে থাকলো। সে ভুলে গেল খামারে যাবার কথা।

ভুলে গেল পিতার নির্দেশ। সারাদিন সে কাটিয়ে দিল তাদের সাথে গির্জায়।

বেলা বাড়তে থাকে। একসময় দিনের সূর্য হারিয়ে যায়।

নেমে আসে সন্ধ্যার কালো ছায়া। নওজোয়ানের মনে পড়ে বাড়ি ফেরার কথা। ফেরার সময় তার মনে প্রশ্ন জাগে, এ ধর্মের উৎস কোথায়?

গির্জার লোকেরা বললো– শামে।

ক্লান্ত। অথচ প্রশান্ত নওজোয়ান। চোখে মুখে আনন্দের ফোয়ারা। পিতা জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি খামারে গিয়েছিলে? কেমন দেখলে?

নওজোয়ান মিথ্যে বললো না। বললো, খামারে না গিয়ে সারাদিন গির্জায় থেকে উপাসনা করেছি।

সর্দার পিতা ছেলের কথা শুনে ক্ষেপে গেলেন। তার চোখ দিয়ে আগুনের হলকা ছুটছে।

ছেলে আগুনের উপাসনা না করে গির্জায় উপাসনা করেছে! ধর্মান্তরিত হচ্ছে!

পিতা ভুলে গেলেন স্নেহের কথা। আদরের কথা। তিনি নিষ্ঠুরভাবে ছেলের পায়ে বেড়ি দিয়ে পুনরায় ঘরে আবদ্ধ করে রাখলেন।

আবদ্ধ ঘরে হাওয়া ঢোকে না।

ছেলেটি কাঁদে মুক্তির প্রার্থনা করে।

খ্রিস্টানদের কাছে গোপনে খবর পাঠায়। শামের দিকে যদি কোনো কাফেলা যায় তাহলে তাকে যেন কৌশলে মুক্ত করে নিয়ে যায়।

খ্রিস্টান ধর্মের মূল উৎস শামে। সেও শামে যাবে। সেখানে গিয়েই তার হৃদয়ের ইচ্ছা পূরণ করবে।

কিন্তু তার ইচ্ছা পূরণ হচ্ছে না। সে পায়ে বেড়ি নিয়ে প্রতীক্ষায় থাকে। কেবলই প্রতীক্ষা করে– কখন আসবে সেই সোনালি সুযোগ?

একদিন সুযোগ এলো।

রাতের গভীরে নওজোয়ানকে উদ্ধার করে একটি কাফেলা তাকে নিয়ে গেল শামে।

নতুন শহর শাম। নওজোয়ানের চোখে মুখে অবাক– বিস্ময়। সে জিজ্ঞেস করলো, এখানকার সর্বোত্তম এবং সবচেয়ে জ্ঞানী ব্যক্তি কে?

তারা জবাব দিল– বিশপ। গির্জার পুরোহিত।

নওজোয়ান তার কাছে গেল।

পুরোহিতের খেদমতে নিজেকে উজাড় করে দিল। পুরোহিতকে সে ভালো করে দেখতে থাকলো। তার স্বভাব, তার চরিত্র, তার আচরণ– সবকিছু। তাকে দেখে আর তার সাথে থেকে নওজোয়ানের মনটা খারাপ হয়ে গেল। তার বুকে জমে উঠলো ঘৃণা ও কষ্টের মেঘ।

সবাই যাকে ভালো মানুষ বলে জানে– আসলে সে আদৌ ভালো মানুষ ছিল না।

তার ছিল লোভ আর মিথ্যার ছলনা। সে সবাইকে সওয়াবের লোভ দেখিয়ে দান খয়রাত করতে বলে। পুরোহিতের কথায় সবাই দান করে অঢেল টাকা। অনেক স্বর্ণ। অনেক সম্পদ। পুরোহিত এসব দানের সম্পদ গচ্ছিত রাখে তার গোপন গুদামে। আর সেসব সম্পদ এবং অর্থ নিজেই আত্মসাৎ করে।

পুরোহিত মারা গেলে তার ভক্তরা তাকে দাফন করতে এলো।

নওজোয়ান সবাইকে বললো– এ পুরোহিত ভালো মানুষ ছিল না। তোমাদের দানের সম্পদ আত্মসাৎ করে নিজেই ভক্ষণ করেছে আর জমা করে রেখেছে গোপন গুদামে।

সত্যি বলছো? তা হতেই পারে না। উনি আমাদের বিশপ। আমাদের পুরোহিত। এমন কাজ তার পক্ষে কি করা সম্ভব?

নওজোয়ান গোপন গুদামে তাদেরকে নিয়ে গেল। তারা দেখলো গচ্ছিত সম্পদের পাহাড়।

এমন ভণ্ড তাপসকে কি দাফন করা যায়?

তারা তাদের বিশপের লাশকে ঘৃণায় আর ক্ষোভে শূলে বিদ্ধ করে ঝুলিয়ে রাখলো।

মানুষেরা দেখুক– ভণ্ডামির এবং পাপের কি সাজা!

ভণ্ড বিশপের মৃত্যুর পর এলো আর একজন বিশপ। নওজোয়ান তার সেবা করা শুরু করলো। বিশপের মৃত্যুর সময় সে জিজ্ঞেস করলো–

আপনার মৃত্যুর পর আমি আর কার কাছে যেতে পারি? কে সবচেয়ে সত্যবাদী পুরুষ? বেশি ধর্মভীরু?

বিশপ বললো, মাওসেলে এক ব্যক্তি আছেন। তার নামও তোমাকে বললাম। তিনি অপেক্ষাকৃত ভালো এবং সৎ মানুষ। তুমি তার কাছে যেতে পারো।

বিশপের মৃত্যুর পর নওজোয়ান মাওসেল গেল। খুঁজে বের করলো লোকটিকে। তাকে দেখে নওজোয়ানের ভালো লাগলো। শ্রদ্ধা করার মতো ব্যক্তি বটে! কিন্তু তিনি অনেক বৃদ্ধ হয়ে গেছেন। নওজোয়ান তাকে মনপ্রাণ দিয়ে সেবা করে।

একদিন বৃদ্ধের মৃত্যুর সময় উপস্থিত হলো। নওজোয়ান কেঁদে ফেললো। এবার আমি কার কাছে যাবো?

বৃদ্ধ দুঃখভরা হৃদয়ে বললেন, তোমার সত্য সন্ধানের নেশা আমাকে মুগ্ধ করেছে যুবক! তোমার মতো এতো ভালো– উৎসাহী ব্যক্তি আমি আর পাইনি। নসিব মন্দ! আমি বিদায় নিচ্ছি। আমরা যে বিশ্বাসের ওপর অটল ছিলাম, এখন আর তেমন কোনো সত্যপুরুষ এ ধর্মে নেই। তবু তুমি আমার মৃত্যুর পর নাসিবীনে যেতে পারো। সেখানে এক ব্যক্তি আছেন এই নামের লোকটির কাছে তুমি থাকতে পারো।

বৃদ্ধের মৃত্যুর পর নওজোয়ান সত্য সন্ধানে পুনরায় যাত্রা করে নাসিবীনের দিকে।

বহু কষ্ট করে সে পৌছুলো সেখানে। খুঁজে বের করলো তাকে।

অল্প দিনের মধ্যে তিনিও মৃত্যুমুখে পতিত হলেন। নওজোয়ান বললো, এবার আমি কার কাছে যাবো?

তিনি বললেন আম্মুরিয়াতে এক ব্যক্তি আছেন। তুমি তার কাছে যেতে পারো।

নওজোয়ান আম্মুরিয়ার সেই ধার্মিকের কাছে গেল।

নওজোয়ানের মুখে তার অতীতের ত্যাগ এবং সত্য সন্ধানের কথা শুনে তিনি খুব খুশি হলেন। তাকে কিছু গরু এবং ছাগল প্রদান করলেন।

নওজোয়ানের বুকটা ফুলে উঠলো আনন্দে। মনে পড়লো তার পিতার ঐশ্বর্যের কথা। সম্পদের কথা। কত আদর যত্নে সে পালিত হয়েছে– সে কথা।

কিন্তু সত্য ধর্মের প্রতি হৃদয়ের দুর্বার টানে মুহূর্তে সে ভুলে গেল পারিবারিক সুখ-সমৃদ্ধির কথা।

নওজোয়ান হৃদয়-মন ঢেলে দিয়ে সেবা করে যায় বৃদ্ধকে।

কিন্তু বার্ধক্যের তো আর কোনো ঔষধ হয় না!

মৃত্যুকে তো কেউ আর ফেরাতে পারে না।

ঝরে পড়ার সময় হলে গাছের পাতা যেমন ঝরে যায়, তেমনি– মৃত্যু এলেই তাকে মৃত্যুমুখে সমর্পিত হতে হয়। এর কোনো বিকল্প নেই।

দিনে দিনে বৃদ্ধও মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন।

নওজোয়ানের চোখে বিষাদের কালো ছায়া। এবার সে কোথায় যাবে?

নওজোয়ানের উৎকণ্ঠা দেখে বৃদ্ধ তাকে কাছে ডাকলেন। আদরে আদরে ভরে দিলেন যুবকের হৃদয়। তারপর আস্তে করে বললেন,

আমি জানিনে– এরপর তুমি কোথায় যাবে। আমিতো তেমন কোনো ব্যক্তিকে আর খুঁজে পাচ্ছিনে। যার কাছে তোমাকে পাঠানো যায়। আমরা যে ধর্মের ওপর আস্থাশীল ছিলাম, যে সত্যের ওপর সুদৃঢ় ছিলাম, এখন আর তার ওপর তেমন কোনো সৎব্যক্তি অবশিষ্ট নেই। নেই কোনো সত্য পুরুষ। তবে হতাশ হবার কিছু নেই। অদূর ভবিষ্যতে আরবে একজন ব্যক্তি আসবেন। তিনি নবী। ইব্রাহীমের ধর্মকে তিনি নতুনভাবে প্রচার করবেন। তাঁর ওপর আল্লাহর কিতাব অবতীর্ণ হবে। তাঁর প্রিয় জন্মভূমি ছেড়ে তিনি বড় বড় পাথরের জমিনের মাঝখানে খেজুর উদ্যান বিশিষ্ট ভূমির দিকে হিজরত করবেন। নবুওয়তের নিদর্শন থাকবে তাঁর কাছে। তাঁর দু'কাঁধের মাঝখানে থাকবে নবুওয়তের মোহর। তিনি হবেন সর্বশেষ নবী। সত্যনবী। মহা সম্মানী এই নবী হাদিয়ার জিনিস খাবেন। কিন্তু সাদকার জিনিস তিনি কখনোই খাবেন না। সম্ভব হলে তুমি সেখানে যেতে পারো। তাঁর কাছ থেকে পান করতে পারো সত্য পিপাসার অঢেল

পানি। তোমার যাবতীয় তৃষ্ণা মিটে যাবে তখন।

বৃদ্ধ মারা যাবার পর নওজোয়ান সিদ্ধান্ত নিল আরবে যাবার। কালব গোত্রের কিছু আরব ব্যবসায়ী আম্মুরিয়াতে এলো। নওজোয়ান বললো, আমার এই গরু ছাগলগুলি তোমাদেরকে দেব। বিনিময়ে আমাকে তোমরা আরবে নিয়ে যাবে?

তারা রাজি হয়ে গেল। যুবক চললো তাদের সাথে।

সুদূর আরবে।

কিন্তু লোকগুলো ছিল অসৎ, বিশ্বাসঘাতক।

পথিমধ্যে তারা তাকে বিক্রি করে দিল এক ইহুদির কাছে।

ধনীর ঘরের আদরের সন্তান শুরু করলো দাসত্বের জীবন। আর দাসত্বের জীবন মানেই তো কষ্টের জীবন।

আগুনের জীবন!

অল্পদিনের মধ্যেই হাত বদল হলো যুবক।

বনী কুরাইজা গোত্রের এক ব্যক্তি তাকে কিনে নিল। তারপর তাকে নিয়ে গেল ইয়াসরিবে (মদীনায়)।

মদীনায় এসে নওজোয়ান চারদিকে তাকিয়ে দেখে।

সবকিছু অচেনা অজানা।

কোথাওবা পাহাড় পর্বত। আবার কোথাওবা পাথর কুঁচির বিস্তীর্ণ ভূমি। তারই মধ্যে আবার খেজুরের সুন্দর সাজানো বাগান।

মুহূর্তেই মনে পড়লো তার আম্মুরিয়ার বৃদ্ধের কথা। বৃদ্ধের দেয়া নির্দেশের মধ্যে একটি ছিল– খেজুরের বাগান।

খেজুরের বাগান দেখে নওজোয়ানের প্রাণে আনন্দের মৌমাছি গুন গুন করে উঠলো। মনিবের সাথে সে এখানে অবস্থান করলো।

মন দিয়ে সে মনিবের কাজ করে যায়। তার কাজে কোনো ফাঁকি নেই। সততা আর শ্রমে নেই কোনো চালাকি।

নওজোয়ান খেজুর বাগানে। খেজুর গাছের চূড়ায় উঠে কাজে ব্যস্ত।

মনিব গাছের নিচে বসে আরামে বিশ্রাম করছে।

এমন সময় মনিবের ভাতিজা এসে বললো, মক্কা থেকে আজ এক ব্যক্তি এসেছে ইয়াসরিবে। বনী কায়লারা তাঁর কাছে ছুটে গেছে।

লোকটি নিজেকে 'নবী' বলে দাবি করছে। লোকটির কথা কানে যেতে না যেতেই নওজোয়ান চমকে উঠলো।

তার হৃৎপিণ্ডে রক্তের চাপ বেড়ে গেল। মনে পড়লো– বৃদ্ধের কথা।

এ কি তাহলে সেই নবী! যিনি মক্কা থেকে বিতাড়িত হয়ে মদীনায় হিজরত করেছেন?

গাছ থেকে নেমে এলো সে।

জিজ্ঞেস করলো তার কাছে– তুমি কি বললে? আর একবার বলো তো?

দাসের জিজ্ঞাসায় মনিব রেগে গেল। তার গালে সজোরে চড় বসিয়ে দিয়ে বললো, তোমার তাতে কী হে?

মনিবের চড়ের আঘাতেও দমে গেল না দাস। বৃদ্ধের কথা মতো সে মক্কা থেকে আগত লোকটিকে পরীক্ষা করতে চাইলো। সত্যিই তিনি নবী কি না।

সন্ধ্যার পর নওজোয়ান কিছু খেজুর নিয়ে মক্কা থেকে আগত লোকটির কাছে গেল। খেজুরগুলো তাঁকে দিয়ে বললো,

শুনেছি আপনি পুণ্যবান ব্যক্তি। আমার কাছে কিছু সদকার জন্যে খেজুর আছে। এগুলি আপনি গ্রহণ করুন।

লোকটি খেজুরগুলি নিয়ে তাঁর সঙ্গীদেরকে বললেন– তোমরা খাও।

আশ্চর্য! তিনি নিজে একটি খেজুরও খেলেন না।

নওজোয়ান প্রথম পরীক্ষায় সত্যের সাফল্যে আনন্দিত হলো।

তার বিশ্বাসের ভীত শক্ত হয়ে উঠলো– ইনি সত্যিই সেই নবী। যার কথা বৃদ্ধ আমাকে বলেছিলেন। কিন্তু দ্বিতীয় পরীক্ষাটিও করা প্রয়োজন।

একদিন– বাকি আলগারকাদ গোরস্তানে নবী (সা) তাঁর এক সঙ্গীকে দাফন করছিলেন। তাঁর গায়ে ছিল এক ধরনের ঢিলা পোশাক।

যুবকটি সেখানে গেল। নবীকে দেখতে থাকলো। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। ভালো করে। যুবকটি নবীর কাঁধের দিকে বারবার তাকাতে থাকলো। খুঁজতে থাকলো তার প্রার্থিত নমুনাটি।

যুবকটির উৎসাহ নবীর (সা) দৃষ্টিগোচর হলো।

তিনি বুঝলেন– সে কী দেখতে চায়।

নবীজী নিজের পিঠের চাদরটি সরিয়ে নিলেন। আর সাথে সাথেই বিদ্যুতের মতো চমকে উঠলো নবুওয়তের মোহরটি।

নওজোয়ান বিশ্বাসের সমুদ্রে নেমে যায়। আনন্দে দিশাহারা হয়ে সে নবীজীর মোহরটি চুমুতে চুমুতে ভরে দেয়।

তার দু'চোখ বেয়ে পানি ঝরছে। সে পানি বিষাদের নয়, বিশ্বাসের।

আনন্দের।

পাওয়ার তৃপ্তিতে ভরে উঠলো তার তৃষিত হৃদয়ের দু'কূল।

নবীজী জিজ্ঞেস করলেন– তোমার পরিচয়?

নওজোয়ান তার পরিচয় দিল। সেই সাথে বললো তার পেছনের সকল কথা।

সব শুনে নবীজী খুশি হলেন। আনন্দিত হলেন।

তিনি সঙ্গী-সাথীদেরকে বললেন– নওজোয়ানের জীবনের কথা। তার সত্য অনুসন্ধানের কথা। তার ত্যাগের কথা।

নবীর (সা) সঙ্গীরা সে কথা শুনে খুব খুশি হলেন।

নবীজীর পরামর্শে একদিন দাসত্বের জীবন থেকে মুক্তি পেল নওজোয়ান। কিন্তু শর্তসাপেক্ষে।

মুক্তির পর নবীজীর সাথে থেকেই কাটিয়ে দেন সারাটি জীবন।

সত্যের আলোতে গড়ে তোলেন নিজের জীবন।

দাসত্ব জীবনের কারণে তিনি বদর এবং উহুদ যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতে পারেননি। এই না পারার কারণে তার বুকে জমে থাকে কষ্টের কুয়াশা।

বেদনার বৃষ্টি ঝরতে থাকে অষ্ট প্রহর।

এরপর এলো খন্দকের যুদ্ধ। নওজোয়ান ছিলেন অত্যন্ত বুদ্ধিমান এবং প্রাজ্ঞ। তিনি পরামর্শ দিলেন এই যুদ্ধে পরিখা খননের জন্য। নবীজী তার এই সুন্দর পরামর্শ গ্রহণ করলেন।

খন্দকের যুদ্ধে খনন করা হলো পরিখা।

আদরে আদরে বেড়ে ওঠা এক যুবক।

সত্য গ্রহণের জন্যে ত্যাগ করেছেন জীবনের যাবতীয় সুখ। দুনিয়ার অস্থায়ী জীবনের প্রতি তার ছিল না এতটুকু মোহ। তাইতো তিনি বসবাসের জন্যে তৈরি করেননি কোনো সুন্দর ঘর। বানাননি বিলাসের সামগ্রী।

অতি সাধারণভাবে জীবন যাপন করতেন তিনি।

তিনি ছিলেন একজন প্রকৃত অর্থেই মুসাফির।

মুসাফিরের মতোই ছিল তার জীবন যাপন, কিন্তু আখেরাতের প্রতি ছিল তার অবিচল আস্থা।

আল্লাহর প্রতি ছিল পর্বতের মতো সুদৃঢ় বিশ্বাস এবং নবীজীর প্রতি ছিল অসীম ভালোবাসা।

নওজোয়ানের বয়স বাড়তে থাকে।

বার্ধক্যের সিঁড়িতে পা রাখলেন তিনি। ধাপে ধাপে এগিয়ে গেলেন মৃত্যুর দিকে।

অন্তিম রোগ শয্যায় শায়িত তিনি।

তিনি কাঁদছেন। তার দু'গণ্ড ভিজে যাচ্ছে অশ্রুধারায়।

হযরত সা'দ তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন– আপনি কাঁদছেন কেন? রাসূল (সা) তো আপনার প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন। হাউজে কাউসারের কাছে আপনি রাসূলের সাথে মিলিত হবেন।

তিনি কম্পিত কণ্ঠে বললেন, আমি মৃত্যুভয়ে কাঁদছিনে।

তবে?

তিনি বললেন– রাসূল (সা) আমাদেরকে মুসাফিরের মতো চলতে বলেছিলেন। অথচ আমার কাছে অনেক জিনিসপত্র জমা হয়ে আছে।

সেই জিনিসগুলো আর কিছু নয়। মাত্র একটি বড় পিয়ালা, তামার একটি থালা ও একটি পানির পাত্র। সত্য সন্ধানী, বুদ্ধিদীপ্ত এবং আত্মত্যাগী এই দুঃসাহসী মুসাফিরের নাম সালমান আল ফারসী।

সত্যের আলোর খোঁজে যিনি ছুটেছেন অনন্ত জীবন– দিক থেকে দিগন্তে। এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে।
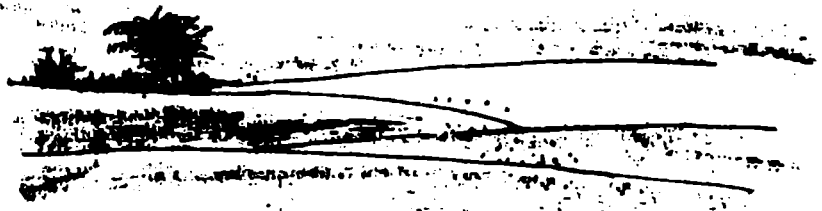
আলোর আবাবিল

মসজিদে জাবিয়া।

একান্তে বসে কথা বলছেন আলোর পাখিরা।

কথা বলছেন ইবন গানাম, আবু দারদা এবং উবাদা ইবন সামিত।

তাঁরা কথা বলছেন 'আল্লাহর দীন' নিয়ে। ইসলাম নিয়ে। কথা বলছেন প্রাণপ্রিয় নবী মুহাম্মাদ (সা)-কে নিয়ে। আরও কত প্রসঙ্গে!

তাঁরা কথা বলছেন আর একে অপরের দিকে মহব্বতের দৃষ্টিতে তাকাচ্ছেন। তাঁদের দৃষ্টিতে জড়িয়ে আছে ভ্রাতৃত্ববোধ, সৌহার্দ্য আর বন্ধুসুলভ-বৃষ্টিধোয়া জোছনার পেলব।

তাঁরা মগ্ন হলেন একে অপরের প্রতি। নিজেদের কথার প্রতি।

গভীর মনোযোগের সাথে তাঁরা শুনছেন পরস্পরের জ্ঞানগর্ভ আলোচনা।

এমনি সময়।—

ঠিক এমনি সময় তাদের মনোযোগ ভেদ করে সেখানে উপস্থিত হলেন আর এক বেহেশতী আবাবিল-হযরত শাদ্দাদ।

শাদ্দাদ উপস্থিত!

সুতরাং সবার দৃষ্টি এখন তাঁর দিকে। কারণ তিনিও যে তাঁদের ভাই! একান্ত আপনজন।
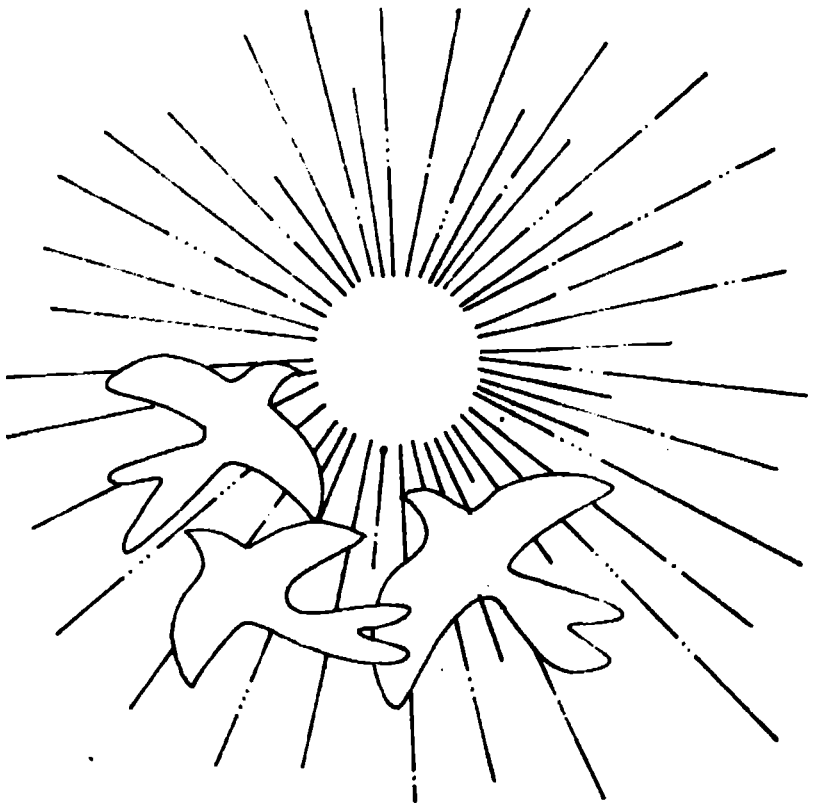
সহোদর ভাইয়ের চেয়েও অনেক কাছের।

কেন নয়?

সবাই যে সেই রাসূল (সা)-এর একই স্নেহের ছায়ায় লালিত! যে রাসূল (সা)-কে ভালোবাসেন প্রাণের চেয়েও অনেক বেশি।

শাদ্দাদ এসেছেন!

তাঁর দিকেই সবার দৃষ্টি। সম্ভবত তিনি কিছু বলবেন। সবাই মনোযোগী হলেন তাঁর দিকে।

শাদ্দাদ এবার গম্ভীর হলেন।

চোখে মুখে কী যেন এক ভয়ের রেখা দুলে উঠলো।

কী যেন এক শঙ্কা!

সে কি শঙ্কা, না কি উদ্বেগ!

ঠিক বুঝা যাচ্ছে না। প্রায় ক্লান্তকণ্ঠে শাদ্দাদ বললেন :

হে প্রাণপ্রিয় বন্ধুগণ!

আপনাদের নিয়ে আমার ভয় হচ্ছে। দারুণ ভয়!

কী সেই ভয়?

জিজ্ঞেস করলেন তারা।

শাদ্দাদ বললেন, সেই ভয়টা হলো : রাসূল (সা) তো বলেছেন, আমার উম্মত প্রবৃত্তি বা ইচ্ছার অনুসারী হয়ে পড়বে। এবং তারা লিপ্ত হবে শিরকে!

চমকে উঠলেন আবু দারদা এবং উবাদা।

বলেন কী? আমরা তো শুনেছি রাসূল (সা)-এর একটি হাদীস :

'আরব উপদ্বীপের শয়তান তার উপাসনার ব্যাপারে নিরাশ হয়ে পড়েছে।'

তাহলে বলুন, বলুন ভাই শাদ্দাদ– মুশরিক হওয়ার অর্থ কী? কী বুঝাতে চাইছেন আপনার ঐ বেদনা-বিধূর বাক্য দিয়ে?

শাদ্দাদ বললেন, ধরুন কোনো ব্যক্তি নামায পড়ে লোক দেখানোর জন্যে। এবার বলুন, ঐ লোকটি সম্পর্কে আপনাদের ধারণাটি কী?

আবু দারদা এবং উবাদা জবাব দিলেন, সে নিশ্চয়ই মুশরিক!

শাদ্দাদ বললেন, ঠিক বলেছেন। আমি রাসূল (সা)-এর কাছে শুনেছি। তিনি বলেছেন, যারা লোক দেখানোর জন্যে এসব কাজ করবে, তারা হবে মুশরিক।

এখানে উপস্থিত ছিলেন আউফ ইবন মালিকও

তিনি বললেন, যতটুকু কাজ লোক দেখানো থেকে মুক্ত হবে,

ততোটুকুই কবুল হওয়ার আশা আছে আল্লাহর কাছে। আর বাকি কাজ, যাতে শিরকের মিশ্রণ আছে, তা কখনো কবুল হবে না। এই হিসেবে আমাদের কাজের ওপর আস্থাবান হওয়া উচিত।

তাঁর কথা শুনে শাদ্দাদ বললেন, রাসূল (সা) বলেছেন, মুশরিকের যাবতীয় আমল তার মাবুদকে দেয়া হবে। আল্লাহ তার মুখাপেক্ষী নন।

পবিত্র আল-কুরআনেও রয়েছে এমনি কথা। আল কুরআন বলছে : 'আল্লাহ্ পাক কোনো অবস্থাতেই শিরকের গুনাহ্ মাফ করবেন না।'

হযরত শাদ্দাদ।

হাদীসের ব্যাপারে তাঁর ছিল দারুণ পাণ্ডিত্য এবং জ্ঞান। তিনি ছিলেন ইসলামের একজন খাঁটি অনুসারী। ছিলেন দীনের ব্যাপারে আপসহীন।

আর ছিলেন ইবাদাতের প্রতি অসীম মনোযোগী।

আল্লাহর ভয়ে তিনি সবসময় থাকতেন কম্পমান। ইবাদাত সেরে হয়তো বা শুয়ে পড়েছেন শাদ্দাদ। গভীর রাত। কিন্তু না, ঘুম আসছে না তাঁর চোখে। কেবলই ভাবছেন। ভাবছেন মৃত্যুর কথা। ভাবছেন আখেরাতের কথা।

ব্যস!

কোথায় আর ঘুম কিংবা শোয়া!

তিনি উঠে পড়লেন। উঠে পড়লেন এবং দাঁড়িয়ে গেলেন আবারও নামাযে। মশগুল হয়ে পড়লেন আল্লাহর ইবাদাতে। আর এভাবেই কেটে গেল সারাটি রাত।

একদিন নয়, দু'দিন নয়। এভাবেই কেটে যেত শাদ্দাদের রাতগুলো। ইবাদাতের মাধ্যমে, নির্ঘুম অবস্থায়। আল্লাহর দরবারে কান্নাকাটি করে।

ইন্তেকাল করেছেন দয়ার নবীজী (সা)।

এসেছে খোলাফায়ে রাশেদার যুগ।

এ সময়ে বেশ কিছুটা পরিবর্তন এসে গেছে মুসলমানদের মধ্যে।

তাদের এই পরিবর্তনে দারুণভাবে ব্যথিত হলেন শাদ্দাদ। ভয়ে এবং শঙ্কায় কেঁপে উঠলো তাঁর কোমল বুক। তিনি কাঁদছেন। কাঁদছেন আর অঝোর ধারায় ঝরে পড়ছে বেদনার বৃষ্টি।

শাদ্দাদ চলেছেন সামনের দিকে।

পথে দেখা পেলেন উবাদা ইবন নাসীকে। নাসীর হাতটি ধরে শাদ্দাদ তার বাড়িতে নিয়ে এলেন।

তারপর–

তারপর আবার কাঁদতে শুরু করলেন। ফুঁপিয়ে কাঁদছেন শাদ্দাদ।

তাঁর কান্না দেখে উবাদা ইবন নাসীও কাঁদছেন।

আপনি কাঁদছেন কেন? শাদ্দাদ জিজ্ঞেস করলেন। নাসী বললেন, আপনার কান্না দেখে আমারও কান্না পাচ্ছে। কিন্তু আপনিইবা কাঁদছেন কেন?

শাদ্দাদ কম্পিত কণ্ঠে বললেন, কাঁদছি– কারণ, রাসূল (সা)-এর একটি হাদীস আমার মনে পড়ছে।

হাদীসটি কী? জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

শাদ্দাদ বললেন, হাদীসটি হলো : রাসূল (সা) বলেছেন,

'আমার সবচেয়ে বেশি ভয় হয় আমার উম্মতের প্রবৃত্তির গোপন কামনা-বাসনার পূজারী হওয়া এবং শিরকে লিপ্ত হওয়ার ব্যাপারে।'

রাসূল (সা)-এর কথা শুনে জিজ্ঞেস করলাম, আপনার উম্মত কি মুশরিক হয়ে যাবে?

রাসূল বললেন, হ্যাঁ। তবে তারা চন্দ্র-সূর্যকে পূজা করবে না। পূজা করবে না মূর্তি, পাথর বা অন্য কোনো বস্তুরও। তারা পূজা করবে রিয়া এবং প্রবৃত্তির। সকল রোযা রাখবে। কিন্তু যখন তার প্রবৃত্তি চাইবে, আর সাথে সাথে নিঃসঙ্কোচে তখন তা ভেঙ্গে ফেলবে।

কী নিদারুণ পরিতাপের বিষয় বলুন! সেই জন্যই আমি কাঁদছি। বললেন শাদ্দাদ।

এমনি তাকওয়ার অধিকারী ছিলেন শাদ্দাদ। আল্লাহর প্রতি ছিল তাঁর এমনি ভয়, ঈমান আর মুসলমানদের প্রতি ছিল তাঁর এমনি অপরিসীম ভালোবাসা।

রাসূল (সা) বসে আছেন।

তাঁর চারপাশ ঘিরে আছে আলোর পরশ।

এমন সময় সেখানে উপস্থিত হলেন শাদ্দাদ।

এ কি!

এ কেমন চেহারা শাদ্দাদের?

সারা চেহারায় বিষণ্ণতার কালো ছাপ!

চোখে-মুখে মেঘের আস্তরণ!

চোখ দু'টো ভারাক্রান্ত!

বিমর্ষতায় ছেয়ে আছে শাদ্দাদ।

অবাক হলেন দয়ার নবীজী (সা)। জিজ্ঞেস করলেন, কী হয়েছে তোমার? শরীর খারাপ? নাকি অন্য কিছু?

শাদ্দাদের কণ্ঠটি ধরে এলো।

বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! মনে হচ্ছে–মনে হচ্ছে আমার জন্যে পৃথিবীটা সঙ্কীর্ণ হয়ে যাচ্ছে!

হাসলেন রাসূল (সা)।

বললেন, না। তোমার জন্যে পৃথিবী সঙ্কীর্ণ হবে না কখনো। নিশ্চিন্তে থাকতে পার তুমি। জেনে রেখ, একদিন বিজিত হবে শাম এবং বাইতুল মাকদাস। আর সেদিন, সেদিন তুমি এবং তোমার সন্তানরা হবে সেখানকার ইমাম।

রাসূল (সা)-এর ভবিষ্যদ্বাণী!

সত্যি তো হতেই হবে।

সত্যিই শাম এবং বাইতুল মাকদাস একদিন বিজিত হলো। আর শাদ্দাদই হলেন সেখানকার নেতা।

তিনি সেখানে সপরিবারে বসতি স্থাপন করলেন।

কেমন ছিল তার তাকওয়া আর পরহেজগারি?

সে এক অনুকরণীয় ইতিহাসই বটে!

একবার একদল মুজাহিদ যাচ্ছেন জিহাদের ময়দানে।

তাদেরকে বিদায় জানাচ্ছেন শাদ্দাদ।

যাবার সময় হলে মুজাহিদরা খাবার জন্যে আহ্বান জানালেন তাকে।

সবিনয়ে শাদ্দাদ বললেন, রাসূল (সা)-এর হাতে বাইয়াতের পর থেকে খাবারটি কোথা থেকে এলো তা না জেনে খাবার অভ্যাস থাকলে অবশ্যই আজ তোমাদের সাথে খেতাম। কিছু মনে নিও না ভাই! তোমরা খাও।

এমন ছিল শাদ্দাদের আল্লাহভীতি।

এমনি ছিল তাঁর দীনদারি।

তিনি বলতেন, কল্যাণের সবকিছুই জান্নাতের। আর অকল্যাণের সবকিছুই জাহান্নামের। এই দুনিয়া একটি উপস্থিত ভোগের বস্তু। সৎ এবং অসৎ সবাই তো ভোগ করে। কিন্তু আখেরাত হচ্ছে সত্য অঙ্গীকার। যেখানে রাজত্ব করেন এক মহাপরাক্রমশালী রাজা। অর্থাৎ মহান রাব্বুল আলামীন। প্রত্যেকেরই আছে সন্তানাদি। তোমরা আখেরাতের সন্তান হও। দুনিয়ার সন্তান হয়ো না।

কী চমৎকার কথা!

শাদ্দাদের মত সোনার মানুষ, খাঁটি মানুষই কেবল বলতে পারেন এমন সোনার চেয়ে দামি কথা।

শাদ্দাদ ছিলেন যেমন খোদাভীরু, তেমনি ছিলেন সাহসী।

তাঁর সাহসের অনেক উপমা আছে।

আছে আগুনঝরা ইতিহাস।

হযরত মুয়াবিয়া (রা) তখন শাসনকর্তা। কী তার দাপট আর ক্ষমতা।

একদিন তিনি জিজ্ঞেস করলেন শাদ্দাদকে।

আচ্ছা, বলুন তো আমি ভালো, নাকি হযরত আলী? আমাদের দু'জনের মধ্যে আপনার কাছে সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তি কে?

স্পষ্টভাষী শাদ্দাদ।

তিনি অকপটে বললেন, আলী (রা) আপনার আগে হিজরত করেছেন। তিনি রাসূল (সা)-এর সাথে অনেক বেশি ভালো কাজ করেছেন। তিনি ছিলেন আপনার চেয়ে বেশি সাহসী। আর তাঁর ছিল আপনার চেয়ে অনেক বেশি উদার ও প্রশস্ত একটি হৃদয়। আর ভালোবাসার কথা বলছেন? আলী চলে গেছেন। তিনি আর আমাদের মাঝে নেই। সুতরাং মানুষ আজ আপনার কাছে তো বেশি কিছু অবশ্যই আশা করে।

এই ছিল শাদ্দাদের সততা। এই ছিল তার সত্যবাদিতা এবং অমলিন জীবন।

ছিল সাগরের মত বিশাল আর আকাশের মত প্রশস্ত একটি হৃদয়। ছিলেন অসীম সাহসী আর ঈমানের ওপর পর্বতের মত অবিচল।

কেন হবেন না?

তিনি তো ছিলেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ, মহান নেতা-প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ (সা)-এরই একান্ত স্নেহ আর ভালোবাসায় সিক্ত।

তিনি তো ছিলেন সত্যের সৈনিক, বেহেশতের আবাবিল।

আল্লাহ যাকে কবুল করেন

মুসলমানদের কিবলা তখন বাইতুল মাকদাস। কাবাঘর তখন কিবলা হয়নি মুসলমানদের জন্যে।

সবাই বাইতুল মাকদাসের দিকে কিবলা করে নামায আদায় করেন।

দয়ার নবী মুহাম্মাদ (সা)-ও।

কিন্তু একজন, একজন ব্যক্তি কেবল বেঁকে বসলেন। না, সবাই বাইতুল মাকদাসকে কিবলা করলেও তিনি করবেন না।

নামায আদায় করবেন না সেদিকে ফিরে।

তাঁর কিবলা তিনি ঠিক করে নিলেন নিজেই, কা'বাঘর।

আশ্চর্যের ব্যাপার!

সাথীরা অবাক।

তাঁকে বুঝাতে চেষ্টা করেন। কতভাবে। বলেন,

এসো। এদিকে ফিরেই নামায আদায় করি। সবাই তাই করেন। এমনকি রাসূলও! তুমি কেন করবে না?

তাঁর সেই একই জিদ।

সিদ্ধান্তে অটল। না! সবাই ওই দিকে ফিরে নামায আদায় করলেও আমি তা করবো না।

আমি পারবো না মক্কার কা'বাকে পেছনে রেখে শামের দিকে মুখ করে নামায আদায় করতে।

কেন পারবে না?

জবাব দেন না তিনি। মুখটা তাঁর গম্ভীর হয়ে যায়। ভারী হয়ে ওঠে চোখের দু'টো কোনা।

সবাই তাকিয়ে থাকেন তাঁর দিকে। তাঁদের চোখেমুখে অপার বিস্ময়।

কথাটি কানে গেল রাসূল (সা)-এর।

তিনি শুনলেন সবকিছু।

তিনিও তখন নামায আদায় করেন বাইতুল মাকদাসকে কিবলা করে।

সেটাই তো তখনকার নিয়ম।
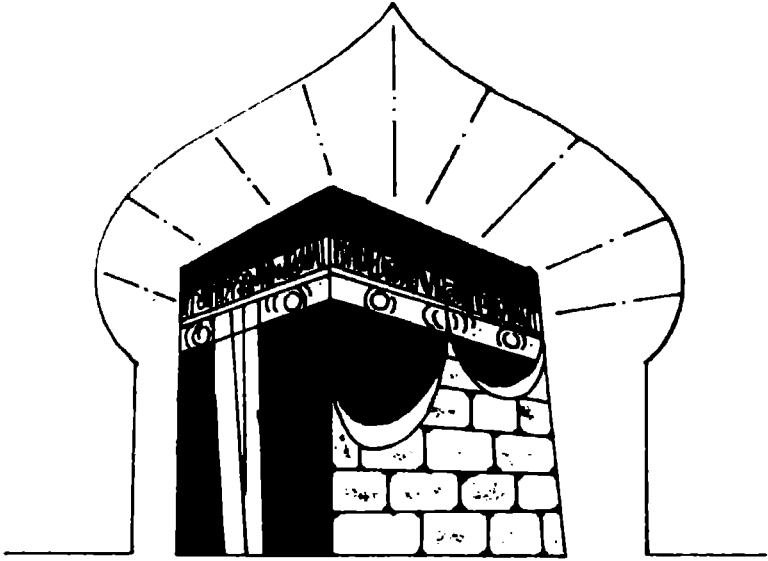
তখনও তো আর কিবলা হয়নি পবিত্র কা'বা।

নবীজী শুনলেন সব।

শুনলেন, মুসলমানদের মধ্যে একজন, মাত্র ঐ একজনই বাইতুল মাকদাসকে কিবলা না করে মক্কার কা'বাকেই কিবলা বানিয়ে নামায আদায় করছেন।

তাঁর নাম– আল বা'রা ইবন মারূর।

রাসূল (সা) বিষয়টি জানতে পেরে তাঁকে নির্দেশ দিলেন, না। কা'বা নয়। আপতত আমাদের কিবলা– বাইতুল মাকদাস। সেইদিকে ফিরেই নামায আদায় করতে হবে। এটাই নিয়ম। এটাই নির্দেশ।

রাসূল (সা)-এর নির্দেশ বলে কথা!

অমান্য করার সাধ্য আছে কার?

তিনিও পারলেন না অমান্য করতে মহান সেনাপতির নির্দেশ।

অগত্যা মুখ ফেরালেন। মুখ ফেরালেন বাইতুল মাকদাসের দিকে।

কিন্তু মৃত্যুর সময়ে তিনিই আবার, সেই আল বা'রা ইবন মারূর– তাঁর পরিবারের লোকদেরকে বললেন–

তোমরা আমার মুখটিকে ঘুরিয়ে দাও কা'বার দিকে। আমি কা'বামুখী হতে চাই।

তাঁর শেষ ইচ্ছা পূরণ করলেন তার পরিবারের সদস্যরা।

আল বা'রা!

ব্যতিক্রমী এক সাহসী পুরুষ!

তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি কা'বার দিকে মুখ করে প্রথম নামায আদায় করেছিলেন।

আবার জীবনের শেষ সময়ে তিনি কা'বাকে কিবলা করেই মৃত্যুবরণ করলেন।

স্রোতের বিপরীতে স্রোত!

হযরত আল বা'রা ইবন মারূর ছিলেন আকাবার শেষ বাইয়াতের একজন সদস্য।

এই বাইয়াতের একজন সদস্য ছিলেন বিখ্যাত কবি– কা'ব ইবন মালিক।

তিনি আল বা'রাকে জানতেন।

খুব কাছ থেকে দেখেছিলেন তাঁকে।

মিশে ছিলেন বন্ধুর মত।

একসাথে কাটিয়েছেন জীবনের অনেকটা সোনালি প্রহর।

কবি কা'ব। তিনি বর্ণনা দিয়েছেন তাঁদের জীবনের সেই প্রথম আলোকময় সময়ের। বলেছেন, সূর্যের ডানা খোলার সেই প্রথমকার কথা।

তাঁদের কওমের সবাই পৌত্তলিক।

ইসলামের সুবিশাল ছাদের নিচে তখনও তাঁরা জমায়েত হয়নি।

উদ্‌ভ্রান্তের মত কেবল ছুটছে আর ছুটছে মিথ্যার পেছনে।

আঁধার অরণ্যে। ক্লান্ত তাঁরা। অবসন্ন।

তাদের প্রয়োজন এখন একটু বিশ্রামের একটু আরামের। একটু শান্তির।

কিন্তু কোথায় সেই চিরন্তন শান্তি!

কওমের সবার চোখে-মুখে জিজ্ঞাসার বৃষ্টি।

হ্যাঁ, সেই শান্তি আছে একমাত্র ইসলামেই।

সেই শান্তি আছে একমাত্র আল্লাহর ইবাদতে।

সেই শান্তি আছে কেবল রাসূল (সা)-এর আনুগত্যে। ভালোবাসায়।

ব্যস!

তারা সিদ্ধান্ত নিলেন। সিদ্ধান্ত নিলেন, রাসূল (সা)-এর হাতে বাইয়াত হয়ে ইসলাম কবুলের।

তবে আর দেরি কেন?

দেরি নয়। ঠিক করলেন, এবার হজের মৌসুমেই তাঁরা যাত্রা শুরু করবেন আল্লাহর দিকে।

রাসূল (সা)-এর দিকে।

মক্কার দিকে।

হজের মৌসুম উপস্থিত।

কওমের কাফেলাও প্রস্তুত।

তাঁরা রওয়ানা দিলেন। রওয়ানা দিলেন মদীনা থেকে মক্কার দিকে।

কাফেলার অগ্রসেনানী বয়োজ্যেষ্ঠ, প্রবীণ নেতা-আল বা'রা ইবন মারূর।

তাঁর নেতৃত্বে কাফেলা এগিয়ে চলেছে।

সামনের দিকে। ক্রমাগত।

তাঁদের সাথে আছে রহমতের ছায়া। ভাসমান মেঘ। প্রশান্ত আকাশ। ঝির ঝির বাতাস।

তাঁরা এগিয়ে চলেছেন আঁধারের প্রাচীর ডিঙ্গিয়ে। আলোকিত উদ্যানের দিকে।

তাঁরা পৌঁছে গেছেন আল বায়দার উপকণ্ঠে।

এ সময়ে আল বা'রা, তাদের দলনেতা বললেন–

শোনো! এই যে আমার সাথীরা! তোমরা শোনো। আমি একটি সিদ্ধান্ত নিয়েছি। জানি না, তোমরা একমত হবে কি না।

কা'বসহ কাফেলার সবাই তাকালেন দলনেতার দিকে। জিজ্ঞেস করলেন, বলুন। কী সেই সিদ্ধান্ত আপনার!

বলুন, আবু বিশর।

মুখ খুললেন আল বা'রা ইবন মারূর। বললেন–

আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি, এই গৃহ অর্থাৎ কা'বার দিকে মুখ করেই সব সময় নামায আদায় করবো। আর কখনও কা'বাকে আমার পেছনে রাখবো না।

তাঁর এই সিদ্ধান্তের কথা শুনে কওমের কাফেলা তো হতবাক! সেই সাথে কা'বও। বলেন কী! সর্বনাশ!

তাঁরা অনুরোধের সুরে বললেন–

কসম! কসম আল্লাহর! এমনটি করবেন না। আমরা তো জানি, সবাই শামের দিকে মুখ করে, বাইতুল মাকদাসকে কিবলা করে নামায আদায় করেন। এভাবে নামায আদায় করেন আমাদের প্রাণপ্রিয়

নেতা– দয়ার নবীজী মুহাম্মাদ (সা)-ও। সুতরাং আপনি একা, একা এমনটি করবেন না হে আবু বিশর!

তাঁদের কথা শুনে একটু হাসলেন। হাসলেন কওমের প্রবীণতম নেতা আল বা'রা ইবন মারূর। বললেন–

আমি সিদ্ধান্তে অটল। আমি ঐ কা'বার দিকেই মুখ করে নামায আদায় করবো।

কী আশ্চর্য!

নামাযের সময় উপস্থিত হলে, সত্যিসত্যিই তিনি সবার অনুরোধ উপেক্ষা করে নামায আদায় করলেন কা'বামুখী হয়ে। সবাই তো বিস্ময়ে বিমূঢ়!

কী এক অবাক দৃশ্য!

কাফেলার সবাই নামাযের জন্যে দাঁড়িয়েছেন শামের দিকে মুখ করে, বাইতুল মাকদাস তাদের কিবলা।

কিন্তু একজন!

একজনই কেবল ঘুরে উল্টোদিকে মুখ করে দাঁড়িয়েছেন। তাঁর কিবলা হলো– কা'বা!

মক্কায় পৌঁছুনোর পর আল বা'রা এবং কা'ব দেখা করলেন দয়ার নবীজীর সাথে। তিনি তখন চাচা আব্বাসকে নিয়ে বসেছিলেন মসজিদের এক কোণে।

তারা উপস্থিত হলে রাসূল (সা) চাচাকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি এই দু'জনকে চেনেন?

আব্বাস বললেন, কেন চিনবো না! এই হলেন আল বা'রা ইবন মারূর। গোত্রনেতা। খুবই প্রভাবশালী। আর এই হলেন মদীনার কা'ব।

– কা'ব? সেই বিখ্যাত কবি? রাসূল (সা) জিজ্ঞেস করলেন?

– হ্যাঁ, সেই কবি।

আল বা'রা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! মদীনা থেকে আসার পথে আমি একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমার ইচ্ছা, বিষয়টি আপনাকে বলি। যদি অনুমতি দেন।

– বিষয়টি কী? রাসূল (সা) জিজ্ঞেস করলেন।

আল বা'রা বললেন, আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি, এই গৃহ– অর্থাৎ কা'বাকে আর কখনও পেছনে রাখবো না। কা'বার দিকে মুখ করেই নামায আদায় করবো! আপনি কী বলেন?

রাসূল (সা) বললেন, আল বা'রা! তুমি যে কিবলার ওপর ছিলে, সেই কিবলার ওপর যদি একটু ধৈর্য ধরে থাকতে!

রাসূল (সা)-এর কথা শুনে, তিনি আবার ঘুরে দাঁড়ালেন শামের দিকে। বাইতুল মাকদাসের দিকে। সেদিকে মুখ করে নামায আদায় করলেন।

কিন্তু মৃত্যুর সময়ে আল বা'রা ইবন মারূর আবার তাঁর সেই প্রথম কিবলা– কা'বার দিকে মুখ করেই ইন্তেকাল করলেন।

বাইয়াত গ্রহণের পর তিনি তাঁর কাফেলাসহ ফিরে গেলেন মদীনায়। মদীনায় ফিরে যাবার কয়েক মাস পরেই তিনি ইন্তেকাল করলেন।

হিজরত করে মদীনায় এলেন দয়ার নবীজী।

মদীনায় পৌঁছেই তিনি সাহাবীদের সঙ্গে নিয়ে চলে যান আল বা'রার কবরে।

চার তাকবীরের সাথে রাসূল (সা) তার জানাযার নামায আদায় করলেন।

তারপর সাহাবীদের নিয়ে তিনি আল বা'রার জন্যে দোয়া করলেন ঃ

হে আল্লাহ!

আপনি আল বা'রা ইবন মারূরের প্রতি রহমত বর্ষণ করুন।

কিয়ামতের দিন তার ও আপনার মাঝে আড়াল না রাখুন এবং তাকে জান্নাতবাসী করুন।

আল বা'রার মৃত্যুর বেশ পরের কথা।

রাসূল (সা) মদীনায় আছেন।

আছেন মদীনার সেই গোত্রপতি, সেই প্রথম কা'বামুখী নামায আদায়কারী–আল বা'রা ইবন মারূর বাড়িতে। আল বা'রার স্ত্রী দয়ার নবীজী এবং তাঁর সাথীদের জন্যে দুপুরের খাবারের আয়োজন করেছেন।

রাসূল (সা) দুপুরের সেই খাবার খেয়ে আল বা'রার বাড়িতেই যোহরের নামায আদায় করার জন্যে দাঁড়ালেন। সাথে আছেন তাঁর সাথীরা।

তাঁরা দাঁড়িয়েছেন– সেই বাইতুল মাকদাসের দিকে মুখ করে।

দু'রাকায়াত নামায শেষ হতেই দয়ার নবীজী পেয়ে গেলেন আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশ। নির্দেশ এলো কা'বামুখী হয়ে নামায আদায় করার জন্য।

আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশ পাবার সাথে সাথেই ঘুরে দাঁড়ালেন নবী মুহাম্মাদ (সা)।

ঘুরে দাঁড়ালেন বাইতুল মাকদাস থেকে কা'বার দিকে।

তখন থেকে কা'বাই হয়ে গেল একমাত্র কিবলা। মুসলমানদের জন্য।

কী সৌভাগ্যবান আল বা'রা ইবন মারূর!

তাঁর সেই সৌভাগ্যের কি কোনো তুলনা চলে?

তিনিই তো প্রথম, যিনি কা'বাকে প্রথম কিবলা বানিয়েছিলেন। আর মহান রাব্বুল আলামীন সেই কা'বাকেই চিরকালের জন্যে কিবলা হিসেবে কবুল করলেন। কবুল করলেন তাঁর অপার করুণায়।

আল্লাহ পাক যাকে কবুল করেন, এভাবেই করেন।

এভাবেই করেন তাঁকে সম্মানিত। আলোকিত।